# ইসলামের আদি উৎস

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মামুন আব্দুল্লাহ

# ইসলামের আদি উৎস

অনুবাদ ও সম্পাদনা

**মামুন আব্দুল্লাহ**

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog

# ইসলামের আদি উৎস

## মামুন আব্দুল্লাহ



প্রথম ইবুক প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৯

ইস্টিশন ইবুক

**প্রকাশক**

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Islamer Aadi Utsho. by Mamun Abdullah

Istishon eBook
First eBook Published in **September, 2019**
**Created by: Dhrubok**

Respect for faith of sincere believers cannot be allowed either block or deflect the investigation of the historians... one must be defended the rights of elementary historical methodology.

- Maxime Rodhinson

## সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

# ভূমিকা

কোথা থেকে এসেছে আজকের ইসলাম? এতদূর পর্যন্ত ইসলামকে কে টেনে এনেছে? কী তার পরিচয়? আসলেই কি ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ নীতিতে নাকি ধর্মীয় বিশ্বাসের বলে? নাকি এসবের পিছনে কারো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে? কে ছিলেন মুহাম্মদ? ঐতিহাসিক নথিপত্রগুলো মুহাম্মদের ব্যাপারে কী সাক্ষ্য দিচ্ছে? কোরান কি আল্লাহ নামের কোন সৃষ্টিকর্তার বাণী? পৃথিবীর একমাত্র অবিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থ? এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা।
প্রাচীন ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করা খুব কঠিন ও দুরূহ একটি বিষয়। কেননা প্রাচীন ইসলাম সম্পর্কিত খুব কম তথ্য বর্তমানে টিকে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ইসলাম সংস্কারের নামে এই তথ্যগুলো নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেক্যুলার হিস্টোরিয়ান ওয়েন্সবার্গ, প্যাট্রিশিয়া ক্রোন, টম হল্যান্ড, কুক, ইহুদা নেভো, অ্যান্ড্রু রিপিন, পুইন, এবং আর্থার জেফ্রি ইসলাম ও কোরান গবেষণা করে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন। তাদের নব্য আবিষ্কার হিস্টোরিকাল ইসলামকে একটি নতুন আকৃতি দান করেছে। প্রচুর অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করেছে। কোরানিক ম্যানুস্ক্রিপ্টের ডেটিং নিয়ে যে নিত্য নতুন তথ্য উঠে এসেছে তা কোরানকে শুধু প্রশ্নবাণে জর্জরিতই করেনি, এর ঐশ্বরিক জ্যোতিও যে নিভে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আবিষ্কারগুলো শুধু কোরানকেই না, সরাসরি মুহাম্মদ এবং তার দর্শনকেও আঘাত করেছে। আমরা আজ বলতে পারি, কীভাবে ও কখন ইসলাম উদিত হয়েছে। ড. জে স্মিথের লেকচার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই আলোচনায়। মূলত জে স্মিথের বই Is the Quran the word of God, Prophet

of Doom, Muhammad, আর্থার জেফ্রির আর্টিকেল, ব্লগার ত্বাহার সানাই ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে গবেষণা, সেমুয়েল গ্রিনের কোরানের বিভিন্ন ভার্সন সম্পর্কিত আর্টিকেলের ছোট খাটো একটি অনুবাদ গ্রন্থ হল 'ইসলামের আদি উৎস'। বাংলা ভাষায় এর আগে ইসলামে ঐতিহাসিকদের মতামত ও গবেষণা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন সংগ্রহ ছিল না। যা আছে তা বিভিন্ন ব্লগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ফলে মুসলিমদের মিথ্যাচার, অযৌক্তিক দাবীগুলো যে কতটা ফাঁপা এবং ভঙ্গুর তা প্রমাণ করতে গিয়ে ব্লগ-ইন্টারনেটের হাজার পৃষ্ঠা স্ক্রল করতে হতো। মুহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবন, যৌন জীবন ও সামন্ত জীবন নিয়ে প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি করা হলেও তার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে বাংলা ভাষায় কেউ তেমন একটা লেখালেখি করেননি। সেকারণেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

**মামুন আব্দুল্লাহ**

সেপ্টেম্বর, ২০১৯

# ইসলামের সার্বজনীন বিবরণ

কোরান মিথ্যা হলে ইসলামের ভিত নড়ে যাবে। মুহাম্মদ যদি আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর না হন তাহলে ইসলামের ভিত নড়ে যাবে। ইসলাম নিয়ে মুসলমানরা যা দাবী করে তা হল মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মুহাম্মদের পূর্বে যত নবী ও রসুল এসেছেন তাদের প্রত্যেকের কোন না কোন অভাব ছিল, সমস্যা ছিল, সীমাবদ্ধতা ছিল, কিংবা তারা সর্বশেষ পয়গাম্বর হওয়ার অনুপযুক্ত ছিলেন, এবং সেই অভাব পূরণ করার জন্যই খাতামুন নবুয়ত হিশেবে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন। তিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ। মুহাম্মদের উপরে নাজিল করা হয়েছে মহা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরান। এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব। কোরান ছাড়াও আরও অনেক আসমানি কিতাব রয়েছে, কিন্তু কোরান নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে বাকী সমস্ত আসমানি কিতাব বাতিল হয়ে যায়। অন্যান্য আসমানি কিতাবগুলো বাতিল হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। মোটা দাগে বলতে গেলে যদি কোরান ও অন্যান্য আসমানি কিতাবের মাঝে কোন অসঙ্গতি বা সত্যতার প্রশ্ন উদয় হয় তবে সব সময়ই কোরানকে গ্রহণযোগ্য হিশেবে বিবেচনা করা হবে। কোরানে এ ব্যাপারে আমরা দুটো রেফারেন্স পাই:

*"আমি যদি কোন আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই; তবে তা অপেক্ষা উত্তম বা সমতুল্য নিয়ে আসি।"- বাকারা: ১০৬*

*"এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাযিল করি আর নাযিল সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন তখন তারা বলে তুমি মিথ্যা রচয়িতা।"- সুরা না'হল: ১০১*

কোরানের আয়াত রোহিত করাকে মানসুখ বলা হয়। আল্লাহ যদি কোন আয়াত রহিত করেন তবে তা হল মানসুখ; এবং রোহিত করা আয়াতের বদলে যখন উত্তম কিংবা সমমানের আয়াত নিয়ে আসেন তা হল নাসিখ। তাই কোরান ও বাইবেলের মাঝে যদি কোন অসঙ্গতি, ভিন্নমত কিংবা বিরোধিতা প্রকাশ পায় তবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট মানসুখ হয়ে কোরান হবে নাসিখ। একারণেই সর্বপরি মুসলিমদের দাবী ইসলাম হল আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

অপরদিকে, মুহাম্মদের জীবন ও বাণীকে সুন্নত বলা হয়। তিনি যা করেছেন, যা কিছু বলেছেন এ সবই সুন্নত, সেগুলো প্রত্যেক মুসলিমের পালন করা উচিত; কেননা তিনি হলেন সকল মানুষের, সকল জাতির ও সর্বকালের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং কোরান তাকে প্রদত্ত উপদেশ। এক কথায় বলা যায় ইসলাম সম্পূর্ণরূপে মোহাম্মদ ও কোরানের উপর নির্ভরশীল। একারণেই আমরা মুহাম্মদ ও কোরান দুটোরই উপর অনুসন্ধান চালাবো। মুসলিমদের দাবীগুলো বিবেচনা করে দেখবো তা কতটুকু সত্য, কতটুকু নির্ভেজাল এবং কতটুকু ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

প্রথমত, মুহাম্মদ ৫৭০ খ্রিস্টব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার উত্তরে অবস্থিত হেরা গুহায় ফেরেশতা জিবরাইলের দেখা পান। মুহাম্মদ তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেই অবস্থায় জিবরাইল এসে তাকে বলেন, 'আবৃত্তি করো' (ইকোরা)। তিনি বললেন, 'আমি আবৃত্তি করতে পারি না' (মা ইকোরা)। জিবরাইল তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মুহাম্মদকে ধরে পরপর তিনবার চেপে দিলেন এবং বললেন, 'ইকোরা'। জিবরাইলের প্রস্থানের পর মুহাম্মদ মক্কায় ফিরে গেলেন এবং ঘটনাটি তার স্ত্রী খাদিজাকে জানালেন। মুহাম্মদ নতুন ওহীগুলো খাদিজাকে দিলেন, খাদিজা সেগুলো নিয়ে তার চাচাত ভাই ওয়াকরা ইবনে নও-ফেলের কাছে যান। ধর্মের দিক থেকে নও-ফেল খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি তৎকালীন ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জানান, মুহাম্মদ একজন পয়গাম্বর। একদিক থেকে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ যে পয়গাম্বর এই মহান ঘোষণাটি এসেছে একজন খ্রিষ্টানের কাছ থেকে।

এরপর মুহাম্মদের উপরে নিয়মিত বিরতিতে আয়াত নাযিল হতে থাকে। ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে তা হল মক্কী আয়াত; এবং ৬২২ থেকে ৬৩৪ পর্যন্ত যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে তা মাদানি। কোরানকে যদি অর্ধেক করা যায় তবে কোরানের শেষ অর্ধেক নাযিল হয়েছে মক্কায় এবং শুরুর অর্ধেক নাযিল হয়েছে মদিনায়।

৬২১ খ্রিস্টাব্দে গভীর রাতে বোরাক নামের একটি পাখাওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চেপে মক্কা থেকে জেরুজালেম যান মুহাম্মদ। জেরুজালেমে অবস্থিত ডোম অব দ্য রক বা কুব্বাত-আল-সাখরা থেকে তিনি চলে যান সরাসরি সপ্তম আসমানে। ডোম অব দ্য রক মূলত জেরুজালেমের পুরনো শহরে অবস্থিত টেম্পল মাউন্টের উপরের একটি গম্বুজ। জেরুজালেমের মূল শহরের মাঝে এক কিলোমিটারেরও কম বর্গাকার দেয়াল ঘেরা অঞ্চলকে পুরনো শহর বলে। খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। ইসলামের সর্বপ্রাচীন স্থাপনা এটি।

সপ্তম আসমানে গিয়ে মুহাম্মদ আল্লাহর সঙ্গে দেখা করেন। আল্লাহ তাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের হুকুম দেন। মুহাম্মদ এই হুকুম নিয়ে দুই আসমান নিচে অর্থাৎ পঞ্চম আসমানে মুসার সঙ্গে দেখা করেন। মুসা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কত ওয়াক্ত নামাজ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে?

মুহাম্মদ বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

মুসা আবার বলেন, তুমি আল্লাহর কাছে গিয়ে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্তের অনুমতি নিয়ে আসো।

মুহাম্মদ তাই করলেন। ফিরে এসে তিনি মুসাকে জানালেন এবং মুসা তা শোনার পর সন্তুষ্ট না হয়ে আবার তাকে আল্লাহর কাছে পাঠালেন নামাজের ওয়াক্ত কমানোর জন্য। মুহাম্মদ এভাবে আল্লাহ এবং মুসার মাঝে উঠা-নামা করে ৪৫, ৪০, ৩৫, ৩০, ২৫, ২০, ১৫, ১০, এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজে এসে থিতু হলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাওয়ার পর মুসা সন্তুষ্ট হন। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় মুসলিমদের কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে তা আল্লাহ কিংবা মুহাম্মদ নির্ধারণ করেন নি, বরং মুসা

নির্ধারণ করেছেন। অথচ কোরানে আমরা দেখি মুসলিমদের মাত্র তিন ওয়াক্ত সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

*“নামাজ কায়েম করো দিনের দু প্রান্তে ও রাতের একাংশে।”– সুরা হুদ: ১১৪*

*“সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ আদায় করুন এবং ফজরের নামাজও... আর রাতে তাহাজ্জুত আদায় করবেন।”- বনী ইসরাইল: ৭৮-৭৯*

*“...আল্লাহর তা’আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়... সকল প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য, রাতে ও দ্বিপ্রহরে, আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে।”– রূম: ১৭-১৮*

*এবং সম্ভবত, “...তোমাদের মালিকানাধীন দাস দাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্করা যেন তোমাদের নিকট আগমন করতে থাকে তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে- ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখো এবং এশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের প্রার্থনার সময়।” -নূর: ৫৮*

এরপর মুহাম্মদ জেরুজালেমে নেমে এসে বোরাকের পিঠে চেপে মক্কায় ফিরে আসেন। এই পুরো ঘটনাটিকে মিরাজ বলা হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের শেষের দিকে মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসেন বা হিজরত করেন। কারো কারো মতে তার সঙ্গে ২০০ জন অনুসারী হিজরত করে। মদিনায় থাকা কালীন তার উপরে মাদানি আয়াত নাযিল হয়। কোরানে মাক্কি ও মাদানি আয়াত আলাদা করা আছে। অবশ্য মাদানি আয়াতসমূহের মাঝে কিছু সংখ্যক মক্কী আয়াত রয়েছে। কিন্তু কোরানের প্রথম অংশের বেশিরভাগ মাদানি এবং শেষের অংশের সিংহভাগই মক্কী আয়াত।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মদিনা থেকে মক্কায় গিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। এরপর আরবের মূল অংশ অর্থাৎ আরব হিজাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ মারা যান। তার অনুসারীদের বিশ্বাস ছিল তাকে বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়েছে।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবু বকর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এরপর ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

উমর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম আরব থেকে বের হয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে আরও বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন। ভূমধ্য সাগরের বড় বড় নগরগুলো আরবরা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে তারই শাসন আমলে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ব ভূমধ্য সাগরের (লাভান্ত) বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক, জেরুজালেম ও কায়রো উমরের নেতৃত্বে আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। উল্লেখ্য এখানে 'মুসলিম' শব্দের বদলে 'আরব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর উপযুক্ত কারণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করবো।

চিত্র: ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামের ব্যাপ্তি

উমরের মৃত্যুর পরে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন উসমান। ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বজাতির হাতে নিহত হন। তৃতীয় খলিফা উসমান আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। ইসলামিক ট্রেডিশন অনুযায়ী তিনিই প্রথম কোরান সংকলন করেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন, যেহেতু মুহাম্মদের মৃত্যুর সময়ে কোরানের গ্রন্থাকারে লিখিত কোন রূপ ছিল না এবং বিভিন্ন ধরণের কোরান চারিদিকে ইতোমধ্যে গিজগিজ করছে তাই কোরান সংকলন করা খুব জরুরী। উসমান মুহাম্মদের ব্যক্তিগত

সহকর্মী যাইদ ইবনে সাবিতকে কোরান নতুন করে লেখতে বলেন। সাবিত কোরান লিখতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষার কারণে সমস্যার মধ্যে পড়লে প্রয়োজনে সংশোধন করার ক্ষমতাও তিনি দিয়ে রাখেন। এছাড়াও তিনি আব্দুল্লাহ বিন আয জুবাইর, সাইদ বিন আল আস, আব্দুর রহমান বিন হারিছ নামের তিনজন সাহাবিকে সাবিতের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করেন। সাবিত বিভিন্ন ডায়ালেক্টের প্রচুর সংখ্যক আয়াত বাতিল করে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৮ বছর পর ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে কোরানের একটি পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ শেষ করেন।

উসমান নিহত হওয়ার পর আলী ক্ষমতায় আসেন। অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাত্র পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। আলী ছিলেন মুহাম্মদের জামাই এবং শিয়া মতবাদের ভিত্তিতে মুহাম্মদের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিজয় থেকে শুরু করে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে আলীর মৃত্যু পর্যন্ত টেনেটুনে ৩১ বছর খেলাফয়ে রাশিদিনের সময়কাল। এই সময়টা ছিল আরবদের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনার, ইসলামের সোনালী ও আরম্ভের সময়। নিচে ইসলামের একটি ক্লাসিক্যাল একাউন্টের কাঠামো তুলে ধরা হল বোঝার সুবিধার জন্য:

| | |
|---|---|
| ৫৭০ | : মুহাম্মদের জন্ম |
| ৬১০ | : হেরাগুহায় জিব্রাইলের দর্শন |
| ৬১০-৬২২ | : মাক্কী আয়াত প্রাপ্তি |
| ৬২১ | : মেরাজ গমন |
| ৬২২ | : মক্কা থেকে মদীনায় গমন |
| ৬২২-৬৩২ | : মাদানী আয়াত প্রাপ্তি |
| ৬৩০ | : মক্কা বিজয় |
| ৬৩২ | : বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মৃত্যু |
| ৬৩২-৬৩৪ | : আবু বকর |
| ৬৩৪-৬৪৪ | : উমর |
| ৬৪৪-৬৫৬ | : উসমান |
| ৬৫৬-৬৬১ | : আলী |

উপরের ক্লাসিক্যাল একাউন্টটি সামান্য একটি কাঠামো, ইসলামের ভিত্তিগত কঙ্কাল। এর মাঝে অনেক ঘটনা, উপ-ঘটনা গল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিগত ১৪০০ বছর ধরে

মুসলিমরা এটিই বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে আসছে। ঠিক ১৪০০ বছর না, প্রায় ১২০০ বছর। স্কুলে, কলেজে, মাদ্রাসায়, ইতিহাসের বইতে অত্যন্ত গর্বের সাথে মুসলিমরা এই গল্প উপস্থাপন করে আসছে। মুসলিমদের বর্ণিত গল্পের বিপরীতে আদৌ যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা জানার কোন উপায় নেই। তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই গল্পটিকেই মান ধরে এগোতে হতো প্রতিটি হিস্টোরিয়ানকে। তিনি সেকুলার নাকি রেডিকাল তাতে তার রচিত ইতিহাসে কোন প্রভাব পড়তো না।

মুহাম্মদের জীবনে প্রাপ্ত খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় "সিরাত আল রাসুলআল্লাহ" বইতে। ইবনে ইসহাক বইটি লেখেন ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এর আগ পর্যন্ত ইসলামের পয়গাম্বরের উপরে কোন লিখিত বায়োগ্রাফি ছিল না। কোথাও কোন সামান্যতম দলিলও নেই যা মুহাম্মদের জীবন সম্পর্কে লিখিত প্রমাণ দিবে। ইসহাকের রচিত গ্রন্থটি পরবর্তী সব ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থের উৎস। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবনে ইসহাক সর্ব প্রথম নবীর বায়োগ্রাফি লিখলেও এর কোন নমুনা, উপাদান, খণ্ডিত টুকরো বর্তমানে পাওয়া যায় না। তাই নবীর বায়োগ্রাফির জন্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করতে হয় ইবনে হিশামের উপরে। ইবনে হিশামের জন্মসাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ধরণা করা হয় তিনি ৮২৮-৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে মারা যান। ইবনে হিশাম ছিলেন ইবনে ইসহাকের ছাত্র। ইবনে হিশাম পয়গাম্বরের বায়োগ্রাফিতে শুধু মাত্র সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন যা তার কাছে মনপূত মনে হয় এবং ইসহাকের লিখিত নবীর জীবনীতে লজ্জাজনক বিষয়গুলো তিনি বাদ দেন। ফলে মুহাম্মদের জীবনের উপরে প্রাপ্ত আমাদের হাতে আসা একমাত্র গ্রন্থটি ছিল ব্যপকভাবে সংক্ষেপিত সংস্করণ। এ ব্যাপারে ইসহাক বলেন, *For the sake of brevity, I am confining myself to Prophet's biography and omitting some of the things which Ishaq recorded in this book in which there is no mention and Apostle and about which the Qur'an says nothing. I have omitted things which are disgraceful to discuss, matters which would distress certain people, and such reports as*

*al-Bukkai [Bukhari?] told me he could not accept as trustworthy- all of these things I have omitted.*[1] অতএব বলা যায় মুহাম্মদের জীবনীতে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে শুধু মাত্র হিশামের রচিত পয়গাম্বরের বায়োগ্রাফি বইতে।

মুহাম্মদের মুখ নিসৃত বাণী ও কর্মগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয় আরও পরে। মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ২৪০ বছর পর। মুখে মুখে প্রচালিত ৬০,০০০ বিশাল সংখ্যক হাদিসের মধ্য থেকে বুখারী বেছে বেছে মাত্র ৭,৫৬৩টি হাদিস সংকলিত করেন তার সহীহ বুখারী গ্রন্থে। হাদিস মুসলিম বিশ্বে কোরানের পর সবচাইতে প্রামাণ্য গ্রন্থ। বুখারী হাদিস লিপিবদ্ধের ধারণা লাভ করেন তার শিক্ষক ইসহাকের কাছ থেকে। মুহাম্মদের বায়োগ্রাফি লেখার পর ইসহাকের স্বপ্ন ছিল হাদিসগুলোকেও তিনি লিপিবদ্ধ করে যাবেন। ইবনে ইসহাকের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে বুখারী ৯৮% হাদিস ফেলে দিয়ে মাত্র ২% হাদিস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

ইসলামের আরও একটি দলিল হল তাফসির। তাফসির হল কোরানের ব্যাখ্যা। প্রথম তাফসির রচনাকারীর নাম আল তাবারি মারওয়ান। তিনি ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাবারি ছাড়াও আরও অনেকের তাফসির বিখ্যাত। যেমন, ইবনে কাসীর, জাফর আস সাদিক, কুরতুবি। ইবনে কাসিরের তাফসির মুসলিম বিশ্বে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হলেও তার সমস্ত উপকরণ গ্রহণ করা হয় তাবারির তাফসির থেকে।

মুহাম্মদ সারা জীবনে কোথায় কী করেছেন, তার জীবদ্দশায় কী ঘটেছে, কোথায় গেছেন, কীভাবে মরেছেন সব কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত। অর্থাৎ তার মৃত্যুর ২০০-৩০০ বছরের মাঝে। এই লিখিত ইতিহাসের দলিলগুলো নিয়ে মুসলিমদের কোন সমস্যা না থাকলেও এগুলো বিনা বাক্যে মানতে নারাজ আধুনিক হিস্টোরিয়ানরা।

---

[1] Smith: Ishaq 69

উপরের চিত্রে মুহাম্মদের জন্ম থেকে শুরু করে তার ফর্মুলা ব্যাপকভাবে প্রচারের একটি টাইমলাইন তুলে ধরা হয়েছে।

২০০ বছর কেন? কেন কারো বায়োগ্রাফি লিখতে দুইশত বছর সময় লাগবে? কেন মুহাম্মদের মুখের বাণী ও কর্ম লিপিবদ্ধ করতে ২৪০ বছর সময় লাগবে? সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে কাদের দ্বারা। যারা মুহাম্মদকে কখনো দেখেনি, তার সঙ্গে ওঠা বসা করেনি। আল বুখারী ছিলেন বুখারস্তানের অধিবাসী। বুখারাস্তান ইরাকের একটি অঞ্চল। আল তাবারি ছিলেন তাবারিস্তানের অধিবাসী। যা বর্তমানে ইরানের একটি অঞ্চল। তারা আরব থেকে শত শত মাইল দূরে এবং মুহাম্মদের মৃত্যুর শত শত বছর পর জন্মেছেন; প্রত্যেকেই নির্ভর করেছেন মৌখিক বিবৃতি বা ওরাল ট্র্যাডিশনের উপরে।

আমরা যদি যীশুর জীবনের দিকে তাকাই তবে তার চারটি বায়োগ্রাফি দেখতে পাই। ম্যাথিউ, মার্ক, লূক এবং জনের লিখিত। তার এই বায়োগ্রাফি লেখা হয়েছে মৃত্যুর ৩০-৪০ বছর পর। তাদের মাঝে জন আরও পরে যীশুর বায়োগ্রাফি লেখেন আনুমানিক ৬০ বছর পর। তবুও জন ছিলেন যীশুর জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী। মার্ক ও লূক তাদের বর্ণনা দুজন প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের দাবী অনুযায়ী যীশুর যে চারটি বায়োগ্রাফি আমরা পাই তা তার সরাসরি সঙ্গীদের কাছ থেকে এসেছে। নিউ টেস্টামেন্ট লিখিত হয়েছিল প্রথম শতকের মাঝেই। মুহাম্মদের জীবনী লেখা হয় ২৪০ বছর পর মৌখিক বর্ণনায়। খ্রিষ্টানদের

একটি গুরুত্বপূর্ণ অজুহাত হল প্রথম তিন শতকে পৌত্তলিকদের সঙ্গে রেষারেষিতে খৃষ্টধর্মের অনুসারী ও সমর্থকদের হত্যার কারণে তারা প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করতে পারেনি। তাই যীশুর ব্যাপারে যেকোনো ঐতিহাসিক সত্যতা প্রথম তিন শতকের আগে কোথাও পাওয়া যায় না।

পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে সেক্যুলার স্কলাররা বরাবরই দুটো বিষয়ের প্রতি আঙ্গুল তুলে আসছেন। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে সপ্তম শতাব্দীর আগে ইসলামের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ২০০-৩০০ বছর পর ইসলাম রীতিমত মাটি-ফুড়ে উদয় হয়। কোরানও মুহাম্মদের উপর ২২ বছর ধরে নাযিল হয়নি। বরং তা লিখিত হতে এবং পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে সময় লেগেছে আরও ২০০ বছর। হামফ্রে লিখেছেন, *আমাদের চেনাজানা ইসলামের, ৭'ম শতকের আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইসলাম প্রকাশ পায় ২০০-৩০০ বছর পর।*[2] রিপিন, লেস্টার, ও ওয়েন্সবার্গ লিখেছেন, *কোরান সম্ভবত একজন মানবের উপর ২২ বছর ধরে নাযিল হয়নি, কোরান আরও ৫০০ বছর পর পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে।*[3] [4] [5] ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ইসলাম শুরু হয় খলিফা আব্দুল মালেকের সময়কালে। তিনি ৬৮৫-৭০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন। তখনই আব্দুল মালেক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ইসলামকে ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর আগে পর্যন্ত যা কিছু পাওয়া যায় তা বানোয়াট। ইতিহাসবিদ কুক এ ব্যাপারে বলেন, *ইসলামের ইতিহাস শুরু হয়েছিল খলিফা আব্দুল মালেকের সময়কালে। তার পূর্ববর্তী সময়ের রচিত ইতিহাস বানোয়াট।*[6] [7] এটি একটি শক্ত দাবী, কিন্তু প্রমাণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন উঠতে পারে ইসলামের বিপুল পরিমাণ ইতিহাস যদি দেরীতে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে তা সম্পূর্ণ করতে এত দীর্ঘ সময় লাগলো কেন? তখনকার জনগণ কি শিক্ষিত

---

[2] Humphreys 1991:71,83-89
[3] Rippin 1985:155;1990:3,2560
[4] Lester 99:44-45;
[5] Wensbrough 1997:160-163
[6] Cook 1983:65
[7] Robbinsion 1996:47

ছিল না? ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলিমরা বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক, জেরুজালেম এবং কায়রো জয় করে। এমন পরিস্থিতিতে কি তাহলে ঐ সমস্ত মহা নগরীগুলোতে কেউ লিখতে বা পড়তে জানতো না? পৃথিবীর জ্ঞানের আধার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী পঞ্চম শতকে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেটা তো মিশরেই ছিল।

অধুনা আরব সাম্রাজ্যের সমস্ত খলিফা হাদিস ও মুহাম্মদের জীবনী সংকলনের চিন্তা না করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেয়। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা দখল করে আরবরা। এরপর ঠিক বিপরীতে থাকা ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি জমায় তারা। ৭'ম শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ আব্দুল মালেকের সময়কালে আরবরা পশ্চিমের স্পেন থেকে পূর্বের ভারতবর্ষ পর্যন্ত পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অথচ এই সুবিশাল এলাকায় এমন কেউ কি ছিল না যার দ্বারা ইসলামের ইতিহাস বা নবীর বাণী লেখা সম্ভব?

মুসলিমরা বেশ গর্বের সাথে দাবী করে তারা লিখতে এবং পড়তে জানতো। নইলে কোরান আসবে কোথা থেকে? যেহেতু কোরান একটি বই সেহেতু কোরানের শব্দ ও বর্ণ দুটোই রয়েছে; এবং ইসলামিক ট্র্যাডিশন আমাদের বলে কোরান লিপিবদ্ধ করেছিলেন মুহাম্মদের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী যাইদ ইবনে সাবিত। অথচ মুহাম্মদের বায়োগ্রাফির উপাদান সমূহ পাওয়া গেছে তার মৃত্যুর কয়েক প্রজন্ম পরের বিভিন্ন ব্যক্তির মৌখিক বর্ণনা থেকে। যেটাকে ইংরেজিতে ওরাল ট্র্যাডিশন বলা হয়। ওরাল ট্র্যাডিশন অনেকটা চাইনিজ উইস্পার গেমের মতো যা বিশ্বজুড়ে বাচ্চাদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় একটি খেলা। চাইনিজ উইস্পার গেমে একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে গোপনে কিছু বলে। দ্বিতীয় শিশুটি পাশে বসে থাকা শিশুটিকে গোপনে ঐ একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করে এবং এমনই ভাবে তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে বলার মাধ্যমে বার্তাটি একজন থেকে আরেকজনের মাঝে চলে যায়। এভাবে শেষ শিশুর কানে বার্তাটি বলা হলে সে জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে তা উচ্চারণ করে। তখন সারির প্রথমে থাকা শিশুটি বার্তা শুনে নিজের বার্তার সঙ্গে পার্থক্য বিবেচনা করে দেখে কোথাও কোন বিকৃতি ঘটেছে কিনা। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রথম শিশুটি নিজের

বার্তার সঙ্গে শেষ শিশুর বার্তার বড়সড় পার্থক্য লক্ষ্য করে। খেলার জন্য খুবই মজাদার একটি খেলা।

মুসলিমরা তাদের ওরাল ট্র্যাডিশন নামের চাইনিজ উইস্পার গেমকে অবিকৃত দাবী করে তা হাস্যকর। কেননা ওরাল ট্র্যাডিশনের প্রথম সমস্যা হল এটি বিকৃত হয়ে যায়। বিকৃত যদি মুহাম্মদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তির পরিচয়ে হয়ে থাকে তবে তা আরও বেশি উদ্বেগজনক। ওরাল ট্র্যাডিশন বা মৌখিক বর্ণনায় কোনভাবেই ভরসা করা যায় না। অপরদিকে মুসলিমরা ইতিহাসের কোন পরাজিত শক্তি ছিল না। তারা অসহায় ছিল না, মুসলিমরা কারো দ্বারা নির্যাতিত হয়নি, খ্রিষ্টানদের মতো নিপীড়িতও হয়নি। খ্রিষ্টানরা যেমন দাবী করে প্রথম ৩০০ বছর তাদের ধর্ম আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল, পৌত্তলিকদের নির্যাতন সহ্য করেছে, তাদের বাইবেল, অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি ধ্বংস করা হয়েছে; রোমানদের দ্বারা ৩০০ বছর শোষিত হয়েছে; ইসলাম ঐ সমস্ত অজুহাত দেখাতে পারবে না। বরঞ্চ তারা মানব ইতিহাসের সবচাইতে বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছে ইসলামের জন্মের শুরু থেকেই। কোরান ধ্বংস, হারানো বা পুড়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

***

# আধুনিক ঐতিহাসিকগণ

প্রাচীন আরব ও প্রাচ্য সভ্যতা নিয়ে যে সমস্ত গবেষকরা গবেষণা করতেন তাদের ওরিয়েন্টালিস্ট বলা হয়। তারা ঐ অঞ্চলের ইতিহাস, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। ইতিহাস রচনায় উনিশ শতকে ওরিয়েন্টালিস্টদের দৃঢ় প্রভাব ছিল। দীর্ঘদিন ইসলামের ইতিহাস এই ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণার কাঁধেই ভর করে টিকে থেকেছে। মধ্য যুগে হাদিস ও কোরান সৃষ্টির পর আঠারো-উনিশ শতকে এসে ওরিয়েন্টাল সোসাইটি আরবের যে চিত্র উপস্থাপন করে গেছে, যেভাবে আরব ইতিহাসকে পুনরায় গঠন করেছে, যে বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যা গল্প তারা সাজিয়েছে তাতে করে আরব সাম্রাজ্যবাদের নতুন যুগ শক্ত একটি ভিত পায়। প্রাচীন মৌখিক ইতিহাসকে লিখিত ইতিহাস দ্বারা বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে আরব প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়ন করাই ছিল এই সোসাইটির মূল কাজ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকদের গবেষণার ধরণ বদলেছে। তারা এখন আরও নির্ভরযোগ্য সূত্র ও প্রমাণ চান। তাই তারা সরাসরি মৌখিক বর্ণনা গ্রহণ করতে নারাজ।

আধুনিক গবেষকরা ইসলাম নিয়ে বেশ কিছু বিব্রতকর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাদের গবেষণায় নতুন মাত্রা ও স্বচ্ছতা সৃষ্টির ফলে পুরনো ও প্রাচীন ওরিয়েন্টালিজম মুখ থুবড়ে পড়েছে। আধুনিক খ্যাতনামা গবেষকদের মাঝে প্রথমেই ড. জন ওয়েন্সবার্গের নাম উঠে আসে। তিনি একজন আমেরিকান হিস্টোরিয়ান। তিনি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকার স্টাডিজের উপরে শিক্ষকতা করতেন। সত্তরের দশকে তিনি ‘কুরানিক স্টাডিজ: সৌর্স এন্ড মেথডস অব

স্ক্রিপচুয়াল ইন্টারপ্রেটেশন (১৯৭৭) ও দ্য স্পেকটেরিয়ান মিলিউ: কন্টেন্ট এন্ড কম্পোজিশন অব ইসলামিক স্যালভেশন হিস্টোরি (১৯৭৮) নামে দুটি বই লেখেন। মুহাম্মদের সঙ্গে ইসলামের বুনিয়াদী যে ভাবনা রয়েছে তাতে তিনি শুধু ধাক্কাই দেননি তার পরবর্তী গবেষকদের এটি ব্যপকভাবে প্রভাবিতও করে।

ড. জেরাল্ড হটিং স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের এমেরিটাস প্রফেসর। তিনি ওয়েন্সবার্গের গবেষণাকে উপজীব্য করে আরও বিষদ গবেষণা চালান। দ্যা ফার্স্ট ডাইনেস্টি অব ইসলাম: দ্যা উমাইয়াহ খিলাফত (১৯৮৬), জন ওয়েন্সবৌর্গ, ইসলাম এন্ড মনোএথিজম (১৯৯৭), দ্য আইডিয়া অব আইডলেটারি এন্ড ইমারজেন্স অব ইসলাম: ফ্রম পলেমিক অব হিস্টোরি (১৯৯৯) হল তার লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়াও এপ্রোচেস টু দ্যা কোরান (১৯৯৩), দ্যা ডেভেলপমেন্ট অব ইসলামিক রিচুয়াল (২০০৬) নামে আরও দুটি বই লেখেন যেখানে কোরান ও মুসলিমদের প্রার্থনার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ড. প্যাট্রিশিয়া ক্রোন ড্যানিশ-আমেরিকান লেখিকা ও ইতিহাসবিদ। তিনি রেভেশিওনিস্ট স্কুল অব ইসলামিক স্টাডিজের একজন সদস্য। ড. ক্রোন একাধারে ১৫ টি ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানতেন। ইসলামিক স্টাডিজের উপরে করা তার কাজগুলোকে মাইলস্টোন হিশেবে দেখা হয়। প্যাট্রিশিয়া ক্রোন এবং মাইকেল কুক তাদের বই হেগারিজম (১৯৭৭)-এ প্রাক ইসলামী ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা এর আগে কোন লেখক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। এছাড়াও ইসলামের উৎস এবং বিকাশকে তিনি মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তিনি ইহুদীবাদের সঙ্গে ইসলামের সখ্যতা ও গভীর সম্পর্কের শিকড় সন্ধান করেছেন। ড. ক্রোন দেখিয়েছেন মক্কা না ইসলামের উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিম আরবের কোথাও। তার মেক্কান ট্রেড এন্ড রাইজ অব ইসলাম (১৯৮৭) বইতে প্রাক ইসলামী যুগের বাণিজ্যে নিয়ে আরবদের দাবীকে খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন, *মুহাম্মদ হিজাজের বাইরে কখনো যাননি। অথচ কোরানের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলছে মুহাম্মদের প্রতিপক্ষরা ছিলেন ‘জলপাই*

*চাষি’। জলপাই চাষিদের মাধ্যমে ভূমধ্য সাগরের কোন অঞ্চলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।*[8]

ড. এন্ড্রু লরেন্স রিপিন একজন কানাডিয়ান ইসলামিক স্কলার। তিনি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি অব হিউম্যানিটির সম্মানিত ডিন। ইসলামের ক্লাসিকাল প্রিয়ডের গবেষণামূলক বই মুসলিমস: দেয়ার রিজিয়াস বিলিফস এন্ড প্র্যাকটিসের জন্য তাকে গভীরভাবে স্মরণ করা হয়। এটি সম্ভবত সকল ধরণের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সেরা ঐতিহাসিক বই।

রবার্ট জি হয়ল্যান্ড মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ের উপরে একজন স্কলার এবং হিস্টোরিয়ান। এছাড়াও তিনি ড. প্যাট্রিশিয়া ক্রোনের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে উনি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কে এন্টিক এন্ড আর্লি ইসলামিক মিডল ইস্টার্ন হিস্টোরি বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৮টি ভাষায় লিখতে পড়তে জানেন। সিয়িং ইসলাম অ্যাজ আদারস শ’ ইট বইয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত। এছাড়াও অ্যারাবিয়া এন্ড দ্যা আরব ফ্রম দ্য ব্রোঞ্জ এইজ টু দ্যা কামিং ইসলাম (২০০১), মুসলিমস এন্ড আদারস ইসলামিক সোসাইটি (২০০৪), ইন গড পাথ: দ্যা আরব কনকোয়েস্ট এন্ড দ্যা ক্রিয়েশন অব ইসলামিক কম্পেয়ার (২০০৪) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ড. ইহুদা ডি. নেভো একজন আর্কিওলজিস্ট। নেভো এন্ড করেন ক্রসরোড টু ইসলাম: দ্যা অরিজিন অব দ্যা আরব রেজিওন এন্ড আরব স্টেট তার উল্লেখযোগ্য বই। কোরানের ভাষ্য ও মুহাম্মদের নবীত্ব নিয়ে তিনি প্রচণ্ড সমালোচনা করতেন। তার একক বই দ্য হিস্টোরিক্যাল মুহাম্মদ-এ ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। বইটি এডিট করেন ইবনে ওয়ারাক ছদ্ম নামের একজন লেখক। তার আসল নাম এখনও পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। বইতে তিনি লিখেছেন: *Since external evidence is necessary to corroborate a view derived soley from the Muslim literary account lack of such corroboration is an important argument against that account’s historicity. This*

---

[8] Partricia Crone: Hagarism 1977- pp106, 120ff and others

*approach is therefore more open from the traditional to acceptance of an argumentum e silentio. For if we are ready to discount an uncorroborated report of an event, we must accept that there may be nothing with which to replace it, that the event simply did not happen. That there is no evidence for it outside of the 'Traditional Account' thus becomes positive evidences in support of the hypothesis that it did not happen. A striking example is the lack of evidence, side the Muslim literature, for the view that the Arab were Muslim at the time of the conquest.*[9]

ড. জে স্মিথ গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মুসলিমদের সঙ্গে কাজ করে আসছেন, এবং ইংল্যান্ডের লন্ডনে প্রায় সাতাশ বছর ধরে মুসলিমদের সঙ্গে বিভিন্ন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ড. প্যাট্রিশিয়া ক্রোনের একজন খ্যাতনামা ছাত্র। ১৬টিরও বেশী ভাষায় লিখতে এবং পড়তে জানেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় ক্রিশ্চিয়ান অ্যাপোলজেটিক এবং পোলেমিক হিশেবে পৃথিবীর অসংখ্য রাষ্ট্র ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত বক্তাদের একজন। তিনি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিভিন্ন ক্লাস, সেমিনারের লেকচারার হিশেবে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম পলিমিসিস্টদের সঙ্গে তিনি ৮০টিরও বেশি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। কোরানিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট ও হিস্টোরিকাল রিসার্চের জন্য তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা হয়। জে স্মিথের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো ইজ দ্য কোরান দ্য ওয়ার্ড অফ গড, প্রফেট অব ডুম, মুহাম্মদ।

এছাড়াও জার্মান স্কুলের ড. লুলিং, ড. পুইন, ড. ভন ডি বথমার, ড. ওহিং-এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। এই তালিকায় টম হল্যান্ডের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি জনপ্রিয় ইংরেজ লেখক ও ইতিহাসবিদ। মধ্যযুগের ও প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে তার বেশ কিছু বই আছে যা বেস্ট সেলার হিশেবে খ্যাত। এথেলস্টান, ডাইনেস্টি,

---

9 The quest for the historical Mohammad: 425

মিলেনিয়াম, পার্সিয়ান ফায়ার, ইন দ্যা শ্যাডো অব দা সৌর্ড ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিবিসির দুইটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ ছাড়াও তিনি উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন। ২০১৪ সালে টম হল্যান্ড ২০০ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির একজন যার সাক্ষরের ভিত্তিতে 'দ্যা গার্ডিয়ান' পত্রিকা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ২০১৫ সালে 'নিউ স্টেটসম্যান' ম্যাগাজিনে 'উই মাস্ট নট ডিনাই দ্যা রুটস অব ইসলামিক স্টেট' কলাম লিখে আবার আলোচনায় আসেন। তিনি লিখেছেন, *'আইসিস খিলাফতের অহংকার করে, জিজিয়া কর আরোপ করে, মূর্তি ভাঙে, চোরের হাত কেটে নেয়, জিনার জন্য পাথর মারে, সমকামীদের হত্যা করে এবং মুসলিমদের কালিমা সম্বলিত কালো পতাকা ওড়ায় এটা নিছক কাকতালীয় কোন ঘটনা না।'*

জে স্মিথ এবং টম হল্যান্ড একে অপরের বন্ধু প্রতিম ব্যক্তি। ২০০৬ সালে সেন্ট পলের উপরে নির্মিত একটি ডকুমেন্টারিতে একসাথে কাজ করতে গিয়ে দু'জনে লাঞ্চের সময় নিজেদের কাজ নিয়ে গল্প করছিলেন। ডিনার শেষে জে স্মিথ তাকে বলেন, আমি কিন্তু সেন্ট পলের উপরে কোন বিশেষজ্ঞ নই; কিন্তু তুমি একজন হিস্টোরিয়ান। তুমি বেস্ট সেলার লিখেছ। রোমান সাম্রাজ্য নিয়ে রুবিকন, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিয়ে মিলেনিয়াম, পারস্য সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে পার্সিয়ান ফায়ার লিখেছ। একটু ভেবে দেখতো সপ্তম শতকে এই তিনটি মহা সাম্রাজ্যের পতনের পর কী হয়েছিল?

হল্যান্ড বলেন, অবশ্যই ইসলাম এসেছিল।

জে স্মিথ বললেন, একদম! তোমার পরবর্তী অধ্যায় লেখার জন্য তোমার সামনে এখন সেরা উপকরণ আছে।

টম জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কী করতে হবে? কিসের কথা বলছ তুমি?

স্মিথ এর উত্তরে বললেন, আমি যা বলছি নোট করে নাও।

এরপর জে স্মিথ টম হল্যান্ডকে ইসলামের দশটি হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট বললেন। সেগুলো টম কাগজে টুকে নেন। ২০১২ সালের এক রবিবার ফোন কলের মাধ্যমে জে স্মিথ জানতে পারলেন 'সানডে টাইমস'-এর কভারে জে স্মিথের দেয়া দশটি

হিস্টোরিকাল পয়েন্টের উপরে ভিত্তি করে টম হল্যান্ডের লেখা ‘ইন দ্যা শ্যাডো অব দা সৌর্ড’ বইটি শোভা পাচ্ছে। ৪০০ পৃষ্ঠার বইতে টম হল্যান্ড বেশ কিছু হিস্টোরিকাল প্রশ্ন তুলেছেন, বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলোকে জোড়া লাগিয়েছেন, ইসলামের উৎসগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, কোরানের অসামঞ্জস্যগুলোর দিকে আঙ্গুল তাক করেছেন যার কোন ব্যাখ্যা মুসলিমদের কাছে নেই। বইটি লিখতে তার ছয় বছর সময় লাগে। বইয়ের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনি প্যাট্রিশিয়া ক্রোন, ড. হটিং সহ পৃথিবী বিখ্যাত সব ইসলামিক স্কলারদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন। তাদের গবেষণা, আইডিয়াগুলোকে পাঠক উপযোগী করে ‘ইন দ্যা শ্যাডো অব দা সৌর্ড’ লেখেন। বইটির হার্ডব্যাক কপি ব্রিটেনে সব ধরনের ইসলামিক বইয়ের মধ্যে বেস্ট সেলিং বইয়ের তালিকায় এক নাম্বারে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে একই বইয়ের পেপারব্যাক কপি; এবং তৃতীয় অবস্থানে আল কোরান। টম হল্যান্ডের হার্ডব্যাক এবং পেপারব্যাক দুটো বই কোরানের চাইতে বেশি বিক্রি হয়েছে। এছাড়া তার গবেষণা থেকে নির্মিত ‘ইসলাম: দ্যা আনটোল্ড স্টোরি’ ডকুমেন্টারিতে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ইসলামের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অভিমত উপস্থাপন করেছেন। ০৮ আগস্ট ২০১২ সালে চ্যানেল ফোরে ডকুমেন্টারিটি প্রচারিত হওয়ার পর মুসলিম স্কলার সহ সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একই বছরের নভেম্বরে ডকুমেন্টারিটি পুনঃ প্রচার করা হলে টেলিভিশন চ্যানেলটির বিরুদ্ধে প্রচুর লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। মাত্র এক ঘণ্টা নয় মিনিটের এই ডকুমেন্টরিটি প্রচুর তথ্য ও প্রমাণে ভরপুর। পরবর্তীতে ডকুমেন্টরিটি ইউটিউবে আপলোড করা হলে রিপোর্টের মাধ্যমে তা সরিয়ে ফেলা হয়। তবে চ্যানেল ফোরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এটি পাওয়া যাবে। এছাড়া আমার ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রতি ডকুমেন্টরিটি আপলোড করেছি।

https://www.youtube.com/watch?v=ZklTls1t3-8&feature=share লিঙ্কে গিয়ে ডকুমেন্টরিটি যেকেউ দেখে নিতে পারেন। এটি চমৎকার।

কোরানিক জিওগ্রাফির আরেকজন গবেষক হলেন ড. ড্যান গিবসন। তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। প্রাক-ইসলামী যুগের আরব নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। বাবা এবং দাদার মতোই ইতিহাস, হলি ল্যান্ড, ও আর্কিওলজি নিয়ে আগ্রহ তার মাঝে উত্তরাধিকার সূত্রে কাজ করছে। ড্যান গিবসন সম্পূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। বিশ বছর বয়সের আগেই তিনি আরব্য উপদ্বীপ ভ্রমণ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-৫০০ অব্দের আরব ও নাবাতিয় বাণিজ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন দীর্ঘ কুড়ি বছর। ঘুরে ঘুরে সেই সমস্ত এলাকার জিওগ্রাফিকাল কন্ডিশন দেখেছেন। কোরানে বর্ণিত সমস্ত জিওগ্রাফিকাল অবস্থানগুলোকে বিবেচনা করে বুঝেছেন ইসলামের ইতিহাস রচনায় বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। গিবসন একটি নতুন থিয়োরি উপস্থাপন করেন যা পূর্বের সমস্ত ইতিহাসবিদদের অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। ড্যান গিবসন দেখান ইসলাম কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, মক্কা মুসলিমদের পবিত্র শহর কিনা, মুসলিমদের কিবলা আদৌ মক্কায় কিনা ইত্যাদি। গিবসনের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো হল আর্লি ইসলামিক কিবলা, কুরানিক জিওগ্রাফি, দ্য নাবাতিয়ান বিল্ডার অব পেট্রা।

আধুনিক সময়ের গবেষণাগুলো অনেক তথ্যবহুল ও প্রমাণ নির্ভর। পূর্বের ওরিয়েন্টালিস্টদের মতো পক্ষপাতিত্ব মূলক গবেষণা তারা করেননি। ধর্ম নিয়ে যেকোনো ধরণের গবেষণায় বরাবরই ঐতিহাসিক সত্যতার অভাব রয়ে গেছে। কোন ধর্মই এই পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম না। কেননা ধর্ম এক দিনে গড়ে ওঠে না। বৌদ্ধ ধর্মের কথা ধরা যাক, বৌদ্ধদের ত্রিপিটকের পলি-পুস্তক, সংস্কৃতি পুস্তক, তিব্বতি পুস্তক, চৈনিক পুস্তকগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। জোরোস্ট্রিয়ান ধর্ম নিয়ে জীবন্ত বিতর্ক এখনও চলছে ইরানীদের মাঝে। প্রতি জেনারেশনের গবেষকদের মাঝে গবেষণার অনেক তারতম্য থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগুলো সমৃদ্ধ হয়। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। ইসলামকেও পড়তে হয়েছে ঐতিহাসিক সত্যতার ফিল্টারে এবং পাওয়া যায়নি কিছুই।

***

# প্রাচীন ইসলাম

প্রথমত, ইসলামী স্কলারদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা পাই যেকোনো ধরণের মুসলিম সৌর্সগুলো ৬৯১ খ্রিস্টাব্দের আগে মুহাম্মদের কোন লিখিত রেফারেন্স দিতে পারে না।[10] অর্থাৎ মুহাম্মদের মৃত্যুর ৬০ বছরের মাঝে আরব অথবা মুসলিমদের দ্বারা মুহাম্মদের নাম কোন প্রকার নথি, মুদ্রা, বই, বা অন্য কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, 'মুসলিম' শব্দটির ৬৯০ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন লিখিত রেফারেন্স ছিল না। এমনকি খোদ আরবেও না। ইসলামের উৎপত্তি যদি আরবেই হয়ে থাকে তবে এতটা দীর্ঘ সময় কেউই 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করল না কেন? ৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আরবের শাসক ছিলেন খলিফা আব্দুল মালেক। ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করে তিনি বিশ্ববাসীর সঙ্গে মুহাম্মদের পরিচয় করান। অথচ মুহাম্মদ শুধু মাত্র একজন পয়গাম্বর না, তিনি আরবের শাসকও ছিলেন। একজন শাসকের লিখিত কোন নথি নেই, এবং তা প্রকাশিত করা হয়েছে অন্য আরেকজন শাসকের দ্বারা।[11] এটি কিছুটা অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার বৈকি।

৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনীয় ক্রনিকল মুহাম্মদের উপরে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন নথি। এতে লেখা ছিল মুহাম্মদ একজন ব্যবসায়ী এবং তিনি নবী ইব্রাহীমের ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু সেখানে মুহাম্মদের সার্বজনীন নবীত্বের কোন তথ্য ছিল না। তাকে শুধু স্থানীয় পয়গাম্বর হিশেবে দাবী করা হয়। 'মাঘাজি' নামে নবীর জীবনী ও যুদ্ধ

[10] Volker Popp-Ohlig & Puin 2010:53
[11] Chronical of Jhon of Niku:1602

অভিযানগুলো নিয়ে লিখিত বই ইসলামের প্রাচীন একটি পুস্তক। ‘সিরাত মাঘাজি’ গ্রন্থ নিয়ে ওয়েন্সবার্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা চালিয়েছেন। বইতে নবীর জীবনী ও শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু বইয়ের কোথাও মোহাম্মদকে নবী দাবী করা হয়নি। যদি কোরানের দাবী অনুযায়ী মুহাম্মদ খাতামুন নবুয়ত হয়ে থাকেন তাহলে এই পুস্তকগুলো সে ব্যাপারে কিছু বলছে না কেন?

মুহাম্মদ কে ছিলেন এবং তিনি কী করেছেন তা জানতে হলে আমাদের মুহাম্মদের সময়কালে ফিরে গিয়ে তখনকার প্রমাণগুলোর উপরে নজর দিতে হবে যা আজও টিকে আছে। দুঃখের বিষয় হল এমন কোন প্রমাণ মুসলিমদের হাতে নেই। ইসলামী গবেষণাগুলো ইসলামের প্রথমিক সময়ের প্রায় ১৫০ বছর পরে লিখিত হয়।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত একটি আরব ধর্মীয় প্রস্তর ফলক আবিষ্কার করা হয়। সিরিয়-জর্ডান মরুভূমি থেকে আবিষ্কৃত ফলকটি এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোৎকৃষ্ট একটি প্রমাণ। এর আবিষ্কারক হিব্রু ইউনিভার্সিটির প্রত্নতাত্ত্বিক ইহুদা নেভো। তার নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় নেভো’স রক ইনস্ক্রিপশন। ১৯৯৪ সালে তিনি ফলকটির উপরে গবেষণা করে টুওয়ার্ডস আ প্রিহিস্টোরি অব ইসলাম নামে একটি বই প্রকাশ করেন। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর এই ইনস্ক্রিপশনটি মূলত একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসের উপরে লিখিত। ধারণা করা হয় তাইফের বাঁধের নিকট খলিফা মারওয়ান কর্তৃক ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে এটি লিখিত হয়ে থাকতে পারে। অথবা তারও পরে খলিফা হিশামের দ্বারা। মারওয়ান ছিলেন খলিফা উসমানের ব্যক্তিগত সহকারী। ইনস্ক্রিপশনটি স্পষ্টভাবে ‘ইসলাম’ নিয়ে লিখিত ছিল না তবে ইসলাম সেখান থেকেই বিকশিত হয়ে থাকতে পারে। ইন্সক্রিপশনে আরও বর্ণিত রয়েছে *‘সমস্ত আরবে ধর্মীয় ভিত্তি স্থাপন করা হয় সুফিয়ানি আমলে (৬৬১-৬৮৪)।’*[12]

একটি ধর্মীয় ইনস্ক্রিপশনের মূল উদ্দেশ্যই হল ধর্মীয় এজাহার প্রকাশ বা ধর্মীয় স্মৃতি লিপিবদ্ধ করা। নেভো’স রক ইনস্ক্রিপশনেও তেমন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে এটির অবস্থান বিবেচনা করে ধারণা পাওয়া যায়, ইসলামের

---

[12] Nevo 1994:109

প্রাথমিক সময়ের যে ট্রেডিশনাল ব্যাখ্যা আমাদের চারপাশে চালু রয়েছে তা অনেকটাই ভুল। ধর্মীয় ইনস্ক্রিপশন সহ প্রাচীন সমস্ত লিপিতে মুহাম্মদের নাম না থাকা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এর ফলে পরবর্তীতে সিরাত ও হাদিসের মতো ইসলামের দলিলগুলোকে সৃষ্টি করতে সুবিধা হয়েছে এবং মুহাম্মদ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই পুরো মুসলিম বিশ্বে সবার কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তি হিশেবে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ যে সমস্ত মানবজাতির নিকট অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তা প্রাচীন লিপিগুলোতে পাওয়া যায় না কেন? মুহাম্মদের নাম এবং তিনি একজন পয়গাম্বর তার প্রথম সুস্পষ্ট রেফারেন্স আমরা পাই আরব থেকে শতশত মাইল দূরে খলিফা আব্দুল মালেক কর্তৃক নির্মিত জেরুজালেমে অবস্থিত ডোম অব দ্য রকের অভ্যন্তরে একটি ইনস্ক্রিপশন বা শিলালিপিতে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দের পরে মারওয়ান শাসন আমলে মুহাম্মদের নাম এবং তার ধর্মীয় শিক্ষা উদার নীতিতে পাথর ফলক, মুদ্রা, প্যাপিরাস, কোরান, হাদিস, সিরাত, দলিল ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এক্ষেত্রে মুসলিমরা হয়ত যুক্তি দিতে পারে, অন্য আর দশটা ধর্মের মতই ধর্মগুরুর নাম আরবি ইনস্ক্রিপশনগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে সময় লেগেছে। এর উত্তর দিতে গিয়ে নেভো বলেন, *একটি ইজিপশিয়ান এন্টাকিওনে (৬৪২ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম আরবি প্যাপিরাস আবিষ্কার করা হয়। এটি মূলত খাজনা আদায়ের একটি রশিদ। এর অগ্রভাগে গ্রীক ও আরবি উভয় ভাষাতেই 'বাসমালা' শব্দটি লেখা ছিল। বাসমালা কোন খ্রিষ্টীয় বা আরব মুসলিম ক্যারেকটার না। যদিও বাসমালা দ্বারা অনেক সময় মুসলিমরা বিসমিল্লাহ বাক্যের প্রতিরূপ দাবী করে, কিন্তু এটি তা ছিল না।*[13] নেভো'স রক ইনস্ক্রিপশন স্পষ্টত ধর্মীয় হলেও তাতে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। মুহাম্মদের নামও পূর্বে কোথাও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ মুহাম্মদ চরিত্রটি আরবের সরকারী ধর্মে বসানো হয় তার মৃত্যুর আনুমানিক ৬০ বছর পর। আরব নেতারা বুঝতে পারেন সুবিশাল অঞ্চলকে একটি নীতির নিয়ন্ত্রণে আনতে ধর্মীয় রাজনীতি বা ধর্মীয় ঐক্যর কোন বিকল্প নেই; এবং তখনই তারা আরব সাম্রাজ্যের

[13] Nevo 1994:110

উপর মুহাম্মদের ফর্মুলা প্রয়োগ করেন। মুহাম্মদের ধর্মের জন্য তারা একেশ্বরবাদী ধর্ম ব্যবস্থাকে বেছে নেন। শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে ইসলামের পথ ততটা সহজ ছিল না। একেশ্বরবাদের উৎস যেহেতু ইহুদী-খ্রিষ্টান ধর্ম, তাদের পাইপ লাইনের সঙ্গে যুক্ত হতে বা ইসলামকে একেশ্বরবাদের ধারায় নিয়ে আসতে প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। বড় কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে তার কিছু ফাঁক-ফোকর থেকে যায়। সেগুলোই আধুনিক গবেষকদের গবেষণাগুলোর মাধ্যমে বেড়িয়ে আসছে।

নেভোর মতে, ইনস্ক্রিপশনগুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে মুহাম্মদকে মারওয়ান শাসন আমলে উপস্থাপন করা হয় প্রায় রাতারাতি। হটাৎ করেই আরবের সরকারী ধর্মকে মনোনীত করা হয়। মুহাম্মদের সরকারী ঘোষণা আসার পরই যে সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ সেটি গ্রহণ করেছিল তা কিন্তু না। বছরের পর অ-মুসলিম নীতিবাক্যগুলো ব্যক্তিগত ইনস্ক্রিপশনে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্যই আরবি ও গ্রীক বর্ণনা পত্র-লিপির প্যাপিরাসে বাসমালা শব্দের ব্যবহার ও মুহাম্মদের অনুপস্থিতি দেখা যায়। নেভোর আবিষ্কৃত প্রস্তর ফলকটি খলিফা মারওয়ান অথবা খলিফা হিশামের শাসনামলে লিখিত হয় মুহাম্মদের মৃত্যুর এক প্রজন্ম অর্থাৎ ৩০ বছর পর। সেখানে মুহাম্মদের নাম উল্লেখ থাকলেও মুসলিম শব্দের কোন উল্লেখ ছিল না। মুসলিম শব্দটি বহুল ভাবে প্রচারিত ও লিখিত হতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। খেয়াল করে দেখুন, একই সময়ে কোরানের পাণ্ডুলিপি, হাদিস, সিরাতের লিখিত প্রথা শুরু হয়।

আরবদের দ্বারা মুসলিম শব্দের প্রয়োগ হতে থাকে ঠিক ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে।[14] আরব সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের জন্য যারা যুদ্ধ করছিল, রাজ্য জয় করছিল তারা সেসময় নিজেদের অথবা তাদেরকে সারাসিন, হেজারি, ইসমাইলী, মাঘরেই, মুহাজিরুন ইত্যাদি নামে অবহিত করত।

[14] Nevo & Koren, 2003:234

সারাসিন (বেদুইন) বলা হয় আরবদের। সপ্তম শতকে বাইজেন্টাইন বিজয়ের সময় আরবদের এই নামে ডাকা হয়। ‘সারাসিনে’র সবচে প্রাচীন ব্যবহার টিচিং অব জেকব বা ডকটোরিনা জেকবিতে পাওয়া যায়। সেমিটিক ‘সারিক’ শব্দ থেকে সারাসিন শব্দের উৎপত্তি। আরবি সারিক শব্দের অর্থ চোর, খুনি বা লুটেরা। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমী সারাসিনদের ভৌগলিক অবস্থানের বর্ণনা দেন। টলেমী বলেন, তারা উত্তর সিনাই পেনিনসুলার এলাকায় বাস করত। এটা অবাক করার মতো বিষয় যে সারাসিনদের উল্লেখ প্রাচীন মিশরে ছিল কিন্তু মুহাম্মদের জীবদ্দশায় তার নিজের নাম সারাসিনদের কোন গোত্রের নথিপত্রে যুক্ত ছিল না।

আরবরা নিজেদের ইসমাইলী বা বনী ইসমাইল বলতো। নবী ইব্রাহীম ও মিশরীয় দাসী হাজেরার ছেলে ইসমাইল। তার বংশের কেদর, নাবাত, আব্দেল প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। নাবাতের নাম অনুসারে  নাবাতিয়ান ও বর্তমান আরবদের উৎপত্তি। আবু জাফর আল বকর (৬৭৬-৭৪৩) চৌদ্দ বছর বয়সে তার বাবা আলি বিন হুসাইনকে পত্রে লেখেন, মুহাম্মদ বলেছেন: *The frist whose tongue speoke in clear Arabic was Ismael, when he was fourteen years old.*[15] একটি বিষয় এখানে যুক্ত করতে হবে, মুহাম্মদের বায়োগ্রাফির লেখক ইবনে হিশামই প্রথম বংশ বৃত্তান্তে মুহাম্মদকে ইসমালেইর বংশের সঙ্গে জুড়ে দেন। ইবনে হিশাম এই কাজটি করেছিলেন কেননা ইসলামকে আব্রাহামিক ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কবল থেকে সদ্য দখলকৃত সাম্রাজ্যকে পৈত্রিক সম্পত্তি বলে দাবী করার সবচাইতে সহজ উপায় ছিল এটি।

বুক অব জেনেসিস মোতাবেক হেগার বা হাজেরা ইব্রাহীমের মিশরীয় দাসী ছিলেন। কোন নারীর বংশধরকে সিরিয়ান ভাষায় ‘মাঘরেই’ বলা হয়। মাঘরেব শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। আরেকটি রেফারেন্স থেকে পাওয়া যায় ‘মাঘরেই’ অর্থ ‘বর্বর’। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একটি প্যাপিরাসে ‘মাঘরেই’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়ান ভাষায় এই প্যাপিরাসটি লিখেছেন বিশপ তৃতীয় ইশোয়াইব। তিনি আরবদের

[15] Wheeler:110-111

‘মাঘরেই’ বলে সম্বোধন করেন। সিরিয়ার অর্থোডক্স চার্চের প্রধান দ্বিতীয় এথনেসিয়াস (জন্ম ৬৮৩- মৃত্যু ৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমদের ‘মাঘরেই’ বলে উল্লেখ করেন। জেকব এডিসন ৭০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে লিখিত এক নথিতে মুসলিমদের একই নামে উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগে আরবদের মুহাজির নামেও অবহিত করা হত। মুহাজির অর্থ হল প্রবাসী বা দেশান্তরি। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো লোকদের মুহাজিরুন বলা হয়। ইসলামী মিথলজি অনুসারে তারা ইব্রাহীম ও হাজেরার বংশধর। হাজেরার বংশধরদের পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ফলে মুহাজিররা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে হিজরত বা রোমিং করে বেড়াতো, এবং তারা একসময় নিজেদের মুহাজিরুন ডাকা শুরু করে। সপ্তম শতকে প্রাপ্ত সমস্ত নথি পত্রে মুসলিমদের সারাসিন, হাজেরিন, ইসমাইলী, মাঘরেই, মুহাজিরুন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কেউ কোথাও মুসলিম শব্দটি ব্যবহার করেনি। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের ভেতরে ভূমধ্যসাগরের সমস্ত পূর্বাঞ্চল শাসন করার পরও ‘মুসলিম’ শব্দের উল্লেখ না করাটা কোন কাকতালীয় ঘটনা না।

অপরদিকে মুসলিমরা বরাবরই তাদের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ব্যবসা, যাকাত ইত্যাদির জন্য গর্ব করে আসছে। কোরান হাদিসে বারবার মুসলিমদের যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন, এর মাধ্যমে সম্পদ তৈরি করে ইসলামের খেদমতের কথাও বলেছেন। এমনকি কতটুকু সম্পত্তির উপরে যাকাত দিতে হবে, এর পরিমাপ ও ওজন কতটুকু হবে সে ব্যাপারেও কোরানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে দশমিক পদ্ধতিতে, যে সময় ভারতবর্ষ থেকে শূন্য আরবদের হাত ধরে মুক্ত পৃথিবীতে আগমন করে নি। এটি কোরানের বড় একটি অসামঞ্জস্য। অপরদিকে কোরানের কোথাও মুহাম্মদের তৎকালীন ও তার পরবর্তী সময়ের কারেন্সি বা মুদ্রার উল্লেখ নেই। আরব তথা মক্কা যদি ব্যবসা বাণিজ্যের এত গুরুত্বপূর্ণ রুট বা কেন্দ্র হয়ে থাকে ৫৭০-৬৮৬ পর্যন্ত একটি মুদ্রায়ও মুহাম্মদ, ইসলাম বা আল্লাহ সম্পর্কিত কোন তথ্য ব্যবহার করা হয়নি কেন?

প্রতিটি মুদ্রা সময়ের কথা বলে। ইন্সক্রিপশনগুলো ইতিহাসকে বহন করে। মুদ্রায় যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তির উপস্থিতি না পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে সে সময় তার গুরুত্ব কম ছিল। গুরুত্বহীনতার কারণেই কেউ মুহাম্মদের নাম কোন মুদ্রায় লেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। মুহাম্মদের মৃত্যুর ৬০ বছর পরে একটি মুদ্রায় তার নাম দেখা যায়। এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন আরব সম্রাট মুদ্রায় মুহাম্মদের নাম সংযুক্তির ব্যাপারে ভাবেনি।

চিত্র: আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের মুদ্রায় আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের নাকি মুহাম্মদ?

মুসলিম প্রথম যে মুদ্রাটি পাওয়া যায় তা ৪.২৫ গ্রাম বা এক মিশকাল ওজনের খলিফা আব্দুল মালেক কর্তৃক ৬৯৭-৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রচলন শুরু করা হয়। মার্জিনের অভ্যন্তরে মুদ্রায় 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি খোদাই করা ছিল। আরও একটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে যে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর প্রথম ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদকে অফিশিয়াল মুদ্রায় সংযুক্ত করেন ৬৮৫ বা ৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে। মুদ্রায় মুহাম্মদের নাম ও তিনি আল্লাহর নবী বলে দাবী করা হয়। টম হল্যান্ডের দাবী মুদ্রায় মুহাম্মদের প্রতিকৃতি খোদাই করা

আছে। মুসলিমরা প্রায়ই খলিফা আলী কর্তৃক মুদ্রা প্রণয়নের দাবী তোলে। কিন্তু সে সময় আরবে সাসানিয় বা পারস্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আব্দুল মালেক ইসলামী মুদ্রা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর কালিমা শাহাদা খোদাই করা ২৫-২৮ ডায়ামিটারের একটি মুদ্রা প্রণয়ন করেন। তার একপাশে খোদাই করা ছিল 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এবং তার কোন শরীক নেই'। মুদ্রার বিপরীত পিঠে খোদাই করা ছিল কোরানের ১১২ নং সুরা। বর্তমানের কালিমা শাহাদাতের সঙ্গে মুদ্রায় খোদিত কালিমার বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ' বাক্যটি প্রথম সংযোজিত হয় দামেস্কয় প্রচলিত আরব সাসানিয়ান ৬৯০ খ্রিস্টাব্দের একটি মুদ্রায়। এটি আরব হেজাজের কোন মুদ্রা না। সবচে উল্লেখযোগ্য বিষয় কালিমা তাওহীদ সহ ইসলামের প্রথম তিন কালিমার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কেননা ডোম অব দ্য রকে প্রাপ্ত কালিমা *'that Mohammad is this prophet and nature of Jesus' (rasul Allah wa-abduhu)* সহ তিনটি কালিমা পাওয়া যায়। এর পূর্বে কালিমা বা মুসলিম হওয়ার ঘোষণা প্রত্যায়িত কোন বিষয় ছিল না। 'মুসলিম' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটি মুহাম্মদের মৃত্যুর ৬০ বছর পর নির্মিত ডোম অব দ্য রকের দেয়াল লিখনের আগে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ডোম অব দ্য রক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

ইসলাম ও (মুসলিম) ঈশ্বরের মনোনীত নাম। দুটোই সামেরীয় শব্দ। হিব্রু, আরামিক, সিরিয়ান 'আসালামা' থেকে ইসলামের উৎপত্তি। যেহেতু ইহুদী-খ্রিষ্টান রীতিতে এর সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না তাই ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বর্ণিত শয়তান অথবা জীনের পূজারী মতবাদ গ্রহণ করা কোন ভাবেই সম্ভব না। খ্রিষ্টীয় সৌর্সগুলো বলে প্রাক-ইসলামী যুগে যারা কবিতা ও সাহিত্য চর্চা করত তারা জীন কারিন কর্তৃক তাড়িত। এদের আরবি ভাষায় আসালাম বল হতো। প্রাক ইসলামী যুগে প্রচলিত সাতটি মহাকাব্যের একটি হল 'মুলাকাত'। এটির কিছু অংশ কাবার দেয়ালে টাঙানো থাকতো। আমর বিন কুলসুম এটি রচনা করেছিলেন। কবি বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য গোত্রগুলো তাদের কারিনের গোত্র ভেবে ভয় পেত। একই উপমা খুঁজে পাওয়া যায়

'মেমার মারাক'-এ। এটি প্রাক-ইসলামী যুগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সৌর্স। কিন্তু ড. প্যাট্রিশিয়া ক্রোন এই মতবাদগুলো হাসতে হাসতে নাকচ করে দিয়ে বলেন, *"The possible sense of the root to invoke here is that of 'peace' and the sense of 'to make peace' the reinterpretation of this conception in terms of the ultimately dominant sense of 'submission' can readly be as intended to differentiate the Hagarine covenant from that of Judaism."*[16]

কোরানে মুসলিম[17] শব্দ ব্যবহার করা হলেও সপ্তম শতাব্দীর যে সমস্ত নথিপত্র গবেষকদের হাতে আছে তা থেকে প্রমাণিত হয় মুহাম্মদের জীবদ্দশায় শব্দটি ব্যবহৃত হতো না। কোরানে মুসলিম শব্দটি কোরানিক টেক্সটের ইভ্যুলুশনের সময়ে সংযোজিত হয়েছে। খুব সম্ভবত হাজ্জাজ কর্তৃক কোরান সংকলেরন সময়। স্মিথ তার ডিবেট পেপারে লিখেছেন, মুসলিমদের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হল: কেন সিরাত, হাদিস ও তারিখের মতো ট্র্যাডিশনগুলো ১৫০-৩০০ বছর দেরীতে লেখা হল? মুসলিম কমিউনিটিতে ইসলামের যে ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্ট পাওয়া যায় তা দেড়শ বছরের আগে লিখিত হয়নি। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে আরব কনকোয়েস্ট নিয়ে একটা ছেঁড়া ফাটা ডকুমেন্টও পাওয়া সম্ভব না যার মাধ্যমে ইসহাক, তাবারি, বুখারি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বসে সিরাত-তারিখ-হাদিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো লিখেছেন। হিস্টোরিয়ান ও স্কলার হিশেবে 'ইসলামের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত' সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের উন্নতি ঘটানোর জন্য কোন সূত্রের ছিটেফোঁটাও আমরা খুঁজে পাই না।

কিছু মুসলিম অসম্মতি প্রকাশ করে বলে, মালিক ইবনে আনাস কর্তৃক লিখিত 'মুয়াত্তা' ইসলামের সর্বপ্রাচীন নথি যার মাধ্যমে সিরাত, হাদিস, ও তারিখের মতো দলিলগুলো লেখা হয়েছে। কিন্তু মুয়াত্তায় প্রাপ্ত তথ্যগুলোও বিভিন্ন 'স্কুলড টেক্সট' এর

---

16 Crone-Cook:1977:20

17 Sura 33:35

মাধ্যমে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে একের পর এক প্রজন্মের হাত ধরে। এখন পর্যন্ত মুসলিমরা মুহাম্মদের হাদিস অনুসরণ করার জন্য ইমাম শাফির ইসনাদ অনুসরণ করে। কিন্তু ইমাম শাফির ইসনাদের নিয়মও ৮২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হতো না। মালিক ইবনে আনাস, আবু হানিফা ইবনে হানবাল ও শাফি হলেন ইসলামের চারজন সেরা ইমাম। ইনাদের হাত ধরেই ইসলামের নিয়ম নীতি বা ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এদের মাঝে সবচেয়ে উগ্র মৌলবাদী ছিলেন ইবনে হানবাল, ডাক নাম হানবালি। মধ্য প্রাচ্যে তিনি অত্যন্ত ধর্মান্ধ ব্যক্তি হিশেবে পরিচিত। ইবনে তামিয়ার মতো হানবালি স্কুলের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে সৌদি ওহাবিজম গড়ে উঠেছে।

***

# কোরানিক জিওগ্রাফি

ড্যান গিবসন কোরান গবেষণা করে ৬৫টি জিওগ্রাফিকাল রেফারেন্স বের করেছেন। কোরানে ঘুরে ফিরে ৯টি স্থানের নাম বারবার এসেছে। তার ভেতরে আদ' ব্যবহার করা হয়েছে ২৩ বার। ৭:৬৫; ৭:৭৪; ৯:৭০; ১১:৫০; ১১:৫৯; ১১:৬০/২; ১৪:৯, ২২:৪২; ২৫:৩৮; ২৬:১২৩; ২৯:৩৮; ৩৮:১২; ৪০:৩১; ৪১:১৩; ৪১:১৫; ৪৬:২১; ৫০:১৩; ৫১:৪১; ৫৩:৫০; ৫৪:৫৮; ৬৯:৪; ৬৯:৬ এবং ৮৯:৬ আয়াতগুলোতে আদ' জাতির উল্লেখ রয়েছে। আদ দক্ষিণ আরবের একটি অঞ্চলের নাম।

'সমূদ'এর উল্লেখ রয়েছে ২৪ বার। সমূদ সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয় আরব পেনিনসুলার উত্তরে। কিন্তু প্রাচীন আরব ও কোরানের ভৌগলিক রেফারেন্স বলছে সমূদ সভ্যতার অবস্থান ছিল দক্ষিণ আরবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আদ ও সমূদ জাতি মক্কার আশে পাশে কোথাও বাস করতো না। মক্কা থেকে থেকে ৬০০ মাইল দূরে এই দুটি শহরের অবস্থান। ফলে মুসলিমরা কোরানে একটি বড় ভুল করে ফেলেছে। কোরানের সুরা আরাফের ৭৩ ২ ৭৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে;

*"...আর সমূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছি সালেহকে। তিনি বলেছেন, হে কওম! আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট আয়াত এসেছে; এটা আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন; আল্লাহর জমিনে ছেড়ে দাও, যে খেয়ে বেড়ায়। কুমতলবে স্পর্শ কোর না। করলে তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি পেতে হবে। আর স্মরণ করো আদ জাতির পর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন দুনিয়ার বুকে আবাদ করেছেন, তোমরা মাটি দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করেছ, পাহাড়*

*কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করেছ। অতএব তোমরা আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো। জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।”*

এই আয়াতেই স্পষ্ট বলা হচ্ছে আদ সমূদ জাতির মাঝে একাধিক সম্পর্ক রয়েছে। সমূদ জাতিকে আদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তারা আদ জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষিকাজ এমনকি পশুচারণ ব্যবস্থাকে লালন করেছে। অথচ আদ জাতি বাস করত বর্তমানের ইয়েমেনের হাদ্রামত অঞ্চলে এবং সমূদের বাস ছিল আরবের হেজাজ প্রদেশে। ইতিহাসবিদ ইবনে খালাদুনের লেখায়ও আমরা একই ধরণের ইঙ্গিত পাই। তার গ্রন্থ ‘মুকাদ্দিমাহ’ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন ‘ঐ দুই জাতির ভাগ্যে কী ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে, যখন আদ জাতির রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাদের সহধর্মী সমূদ জাতি সেই স্থলে অভিষিক্ত হয়।’

চিত্র: আদ, সামুদ ময়দান ও সোডোমের অবস্থান

কোরানে ৭ বার ‘ময়দান’ এর উল্লেখ রয়েছে। ময়দানের অবস্থান লোহিত সাগরের কোল ঘেঁষে আকাবা বন্দরের নিকট। পুরো কোরানে মাত্র একবার সরাসরি মক্কা নগরীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

وهو الذى كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا

অর্থাৎ *“...আর তিনি তাদের হাত তোমাদের হাতে তোমাদের হাত তাদের হাতে বারণ করে রেখেছেন মক্কা উপত্যাকায় তোমাদের বিজয়ী করার পর।”*[18]

কোরান ও হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী মক্কার দিকে মনোযোগ দিলে আমরা দেখতে পাই মক্কা একটি উপত্যকা। এর মধ্য দিয়ে সোজাসুজি জল প্রবাহিত হয়, মক্কার ঠিক বাহিরে একটি ‘পিলার অব সল্ট’ ছিল। সকাল-সন্ধ্যা সেই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করার সময় পয়গাম্বর ‘পিলার অব সল্ট’ দেখতে পেতেন।[19] অথচ ভৌগলিক ভাবে পিলার অব সল্ট সোডম নগরীর পাশে অবস্থিত। মক্কা থেকে হাজার কিলমিটার দূরে মুহাম্মদ এখানে কী করতেন? মক্কায় মাঠ, গাছ, ঘাস, কাদামাটি, দোআঁশ মাটি সব পাওয়া যেত। কিন্তু বাস্তবতা হল মক্কায় কোন উপত্যকা নেই, এটি একটি সমতলভূমি। এর মধ্য দিয়ে কোন জলধারা প্রবাহিত হয় না। শুধু মাত্র একটি কূপ ছিল; জমজম কূপ। আশে পাশে কোথাও পিলার অব সল্ট নেই। যা আছে তা মক্কা থেকে ৬০০ মাইল উত্তরে। মক্কায় কোন মাঠ, গাছ, ঘাস, কাদা ও দোআঁশ মাটি নেই। মক্কা তো দূরের কথা সমগ্র আরব ভূখণ্ডে কোথাও জলপাই গাছ পাওয়া যায় না। জলপাই গাছ পাওয়া যায় শুধু ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে। মক্কার মাটি জলপাই গাছের উপযোগী না। সিরিয়ান খ্রিষ্টানের একটি ম্যানুস্ক্রিপ্টে পাওয়া যায় আরবরা দামেস্ক জয় করার সময় সঙ্গে করে অলিভ ওয়েল নিয়ে গিয়েছিল। কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী পাহাড়ের কারণে ক্বাবা ঘর দেখা যেত না। অথচ মক্কার সবচাইতে নিকটবর্তী পাহাড়টি পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মক্কা কোন উপত্যকা না এবং কোরানে বর্ণিত কিছুই মক্কায় নেই। মাঠ, গাছ, ঘাস কাঁদা থাকার তুলনায় মক্কা অনেক অনুর্বর একটি ভূমি।

এরপরও মুসলিমরা মক্কাকে ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের কেন্দ্র মনে করে। কোরানে বর্ণিত আছে:

---

[18] Sura: 48:28
[19] Sura: 37:136-138

ان اول بيت وضع للناس للذى ببكه مباركا وهدى للعالمين অর্থাৎ *"...মানুষের জন্য সর্বাগ্রে যে ঘর তৈরি হয়েছিল তা বাক্কায়"*[20]। এছাড়াও সুরা ৬ এর ৯২ নং আয়াতে মক্কাকে 'উম্মা আল ক্কুরা' 'সকল নগরীর মাতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই 'উম্মা আল ক্কুরা' এর উল্লেখ কোরানে নেই। ইসলামী মতবাদ দাবী করে, এখানেই আদম ও হাওয়াকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল।[21] আমরা আরও জানি, আদম ব্ল্যাক স্টোন বা কালো পাথর ক্কাবায় স্থাপন করেন। ক্কাবায় ব্ল্যাক স্টোনের অবস্থান ইতিহাসে লিখিত হওয়ার সময়কাল খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী। অথচ মুসলিমদের দাবী পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন নগরী মক্কা। কোরানে আরও বর্ণিত হয়েছে ইব্রাহীম ও ইসমাইল ক্কাবা পুনঃনির্মাণ করেন।[22] মুহাম্মদের জন্মস্থান, ক্কাবার এবং কেবলার কারণে মুসলিমদের বদ্ধ মূল ধারণা মক্কা হল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রাচীন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরী। অপরদিকে বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য সূত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমেও জানা যায়নি ইব্রাহীম আদৌ কখনো মক্কায় গিয়েছিল কিনা।

মক্কা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেন। ক্রোন এবং কুকের গবেষণা থেকে বেড়িয়ে আসে, প্রাক ইসলামিক যুগের 'মক্কা' সম্পর্কে প্রথম রেফারেন্স দেন গ্রীক-মিশরীয় জিওগ্রাফার টলেমী। তিনি ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে মক্কাকে 'মাকোরাবা' বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু টলেমীর বর্ণনাকৃত মাকোরাবাই মক্কা কিনা এ নিয়ে গবেষকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। টলেমী মাকোরাবা শহরটির কোন বর্ণনা দেননি, শুধু মাত্র নাম উল্লেখ করেছেন। ড. ক্রোন তার গবেষণায় লিখেছেন, *মক্কা শব্দে আরবি তিনটি মূল বর্ণ রয়েছে (Mecca-MKK) যা কোন ভাবেই মাকোরাবা শব্দের মূল অক্ষরের সঙ্গে মেলে না (Makoraba-MRB)। এছাড়াও সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মক্কা বা*

---

[20] Sura: 3:96
[21] Sura 7:24
[22] Sura 2:125-127

*ক্বাবার পূর্ণ কোন বিবৃতি নথি পত্রে পাওয়া যায় না।*[23] বরং তারা স্বীকার করেছেন মক্কার সর্বপ্রাচীন যে রেফারেন্স পাওয়া যায় 'অ্যাপোকেলিপ্স অব স্যুডো-মেথোডিয়াস'-এর সিরিয়ান ভাষার সংস্করণে।[24] এপোকেলিপ্সটি সপ্তম শতকের শেষভাগে লিখিত। এতে মক্কার উল্লেখ থাকলেও ইউরোপিয়ান ও অপর সিরিয়ান ভাষার অন্য সংস্করণগুলোতে এর উল্লেখ ছিল না। ভাষাবিদদের গবেষণা পত্র 'ভ্যাটিকান কোডেক্সে'ও মক্কা অনুপস্থিত।

মক্কার পরবর্তী রেফারেন্স পাওয়া যায় *Continuatio Byzantia Arabica* এর সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে। অনেক গবেষকদের মতে এর লেখক ইসলাম ধর্মান্তরিত একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব ও আরব প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেন। *Continuatio Byzantia Arabica* এর উৎস সম্পর্কে জানা যায় এটি খলিফা হিশামের শাসনামলে (৭২৪-৭৪৬) লিখিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে মক্কার অস্তিত্বের সকল সমর্থিত সূত্র পাওয়া যায় কোরান লিখিত হওয়ার ১০০ বছর পর। কেন? ৫০০ বছর আগের টলেমীর সংক্ষিপ্ত অনুমান ছাড়া মক্কার আর কোন উল্লেখ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কেন? এর জন্য কেন সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল? শুধু তাই না, মুসলিমরা মক্কাকে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগরী বলেই ক্ষান্ত হয়নি তারা মক্কাকে সপ্তম শতকের আগ পর্যন্ত প্রধান বাণিজ্য পথ বলে দাবী করে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সকল বাণিজ্যের কেন্দ্র বিন্দু ছিল মক্কা। বুলিয়েটের গবেষণা অনুযায়ী প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের বাণিজ্য পথ সম্পর্কে মুসলিমদের দাবী পুরোপুরি অমূলক। এর কারণ হিশেবে তিনি বর্ণনা করেছেন, *Mecca is tucked away at the edge of the peninsula. Only by the most tortured map reading can it be described as a natural crossroads between a north-south route and an east-west one.*[25]

---

[23] Crone- 74 Cook & Cook 1977: 22
[24] Crone & Cook 1977: 22,171
[25] Bulliet 1995:105

সপ্তম শতাব্দীর বাণিজ্য পথের মানচিত্র দেখলে ধারণা কিছুটা স্বচ্ছ হয়। নিচের ছবিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্বলিত এলাকাটি মক্কা। মক্কার উপর দিয়ে কোন বাণিজ্য পথ দেখা যাচ্ছে না। সবগুলো বাণিজ্য পথ গিয়ে মিলেছে পেত্রায়, জেরুজালেম, ও গাজায়। সপ্তম শতকের বাণিজ্য পথে আমরা দেখতে পাই কাফেলাগুলো ভারত ও চীন থেকে আসত মেসোপটেমিয়ায়। তাদের সামনে ছিল হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বত। এজন্য তারা আরব সাগর পার হয়ে ইন্ডিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে পারস্য উপসাগরে পৌঁছাত। এরপর পারস্য উপকূল দিয়ে তারা মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করত। সাসানিয়ান (পারস্য) এবং বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টানদের মাঝে দীর্ঘ ২০০ বছরের অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম শতাব্দীতে যুদ্ধের কারণে বাণিজ্য রুটে কিছু পরিবর্তন আসে। কারাভানগুলো আরব্য উপসাগর ধরে দক্ষিণের অ্যাডেন বন্দরে চলে আসতো। অ্যাডেন বন্দরে মাল খালাস করে সেগুলো উটের পিঠে বা অন্য কোন বাহনের পিঠে চাপিয়ে কাফেলাগুলো তাইফ শহরে পৌঁছাত।
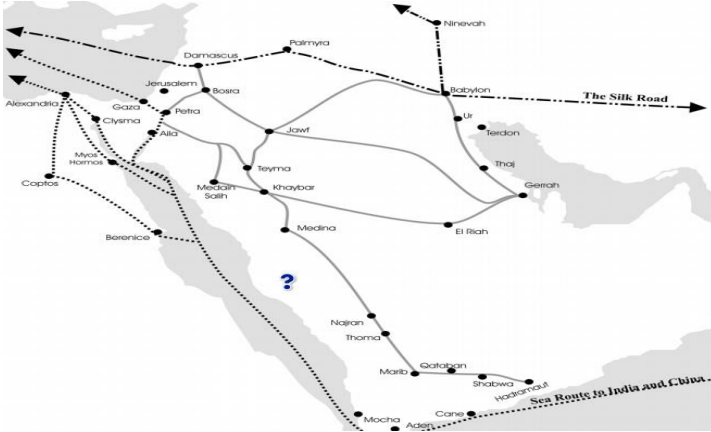
চিত্র: ৭'ম শতকের ট্রেড রুট

ইসলামিক সূত্রগুলো দাবী করে, কারাভানগুলো তাইফ থেকে মক্কায় নেমে আসতো এবং এরপর আবার মদিনার চড়াইয়ে উঠতো, তারপর উত্তরের তাবুত, খায়বার হয়ে গাজায় পৌঁছাত। মুসলিম ওরিয়েন্টালিস্টদের মতে সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই ট্রেড রুট অনুসরণ করা হতো। তাদের দাবী অনুযায়ী এই ট্রেড রুটের কারণেই মক্কা

একটি ধনী ও সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। ড. প্যাট্রিশিয়া ক্রোন এবং অন্যান্য গবেষকরা ওরিয়েন্টালিস্টদের এই দাবী খণ্ডন করেন। মক্কার ট্রেড রুট নিয়ে গ্রুম ও মুলার বিষদ গবেষণা করেছেন। তারা এর বিরোধিতা করে বলেন, *মক্কা কোন সাধারণ ট্রেড রুটের মাঝে পড়ত না। স্বাভাবিক রুটের বদলে ঘুর পথে গেলে মক্কা হয়ত বা কোন বাণিজ্য কেন্দ্র হতে পারে এবং এর জন্য কারাভানগুলোকে প্রায় ১০০ মাইল পর্যন্ত বাইপাস করতে হতো।*[26]

প্যাট্রিশিয়া ক্রোন তার 'মেক্কান ট্রেড এন্ড রাইজ অব ইসলাম' বইতে কিছু কার্যকরী কারণ দেখিয়েছেন যা প্রাচীন হিস্টোরিয়ান এবং ওরিয়েন্টালিস্টরা এড়িয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন, *'মক্কা ছিল একটি অনুর্বর ভূমি। অনুর্বর ভূমিতে কেউ যাত্রা বিরতি করবে না, অপরদিকে আর কিছুটা সামনে গেলেই সুপরিচিত সবুজ শ্যামল এলাকা পাওয়া যাবে। কারাভানগুলো যদি মক্কায় না থেমে আর কিছুটা এগিয়ে যায় তবে যাত্রা বিরতির জন্য তাইফের মতো চমৎকার একটি পরিবেশ পাবে। মক্কায় যদিও খাবার পানি ও থাকার জন্য আশ্রয়স্থল ছিল, কিন্তু এগুলো সব তায়েফেও ছিল। সেখানে আরও বেশি খাবার ও বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যেত।*[27] এছাড়াও প্যাট্রিশিয়া ক্রোন প্রশ্ন তুলেছেন, *'আরবে কোন জিনিসটি সহজ লভ্য ছিল যার জন্য কারাভানগুলো এতটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবে? পুরো আরব অঞ্চল ইনহসপিটেবল পরিবেশ হিশেবে সুপরিচিত। এখন পর্যন্ত আরবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো নন-মেটেরিয়াল বা অধাতু প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে সর্বচ্চ মুনাফা অর্জন করে। সেগুলো সুগন্ধি, মশলা, বা অন্যান্য বহিরাগত বিদেশী পণ্য ছিল না যেগুলোর কথা বহু কুখ্যাত অনির্ভরযোগ্য প্রাচীন লেখকরা বর্ণনা করেছেন।*[28]

ড. ক্রোন তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, *আরবে ১৫ প্রকারের মশলা পাওয়া যেত, যার ভেতরে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই ৬ প্রকার মশলার প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুই প্রকার মশলা সমুদ্র পথে আমদানি করা হতো, দুই প্রকার মশলা এতটাই বাজে ছিল যে তা*

---

[26] Groom 1981:193, Muller 1978:723
[27] Crone 1987: 6-7, Crone & Cook: 1988: 22
[28] Crone 1987: 3

*বেচাকেনা হতো না, দুই প্রকার মশলা আসতো শুধু পূর্ব আফ্রিকা থেকে এবং আরেকটি মশলার পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহ থেকে গেছে, এবং দুই প্রকার মশলা কখনোই সনাক্ত করা যায়নি।*[29] তাহলে কী বেচাকেনার জন্য কোন মক্কা বিখ্যাত ছিল? কিছু মুসলিম স্কলারদের দাবী মক্কা ব্যাংকিং ও উটের বাজারের জন্য বিখ্যাত ছিল। এক্ষেত্রে আবারও বলতে হবে, অনুর্বর ভূমিতে উটের বাজার, ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজব শোনায়।

কিস্টার ও স্পেঞ্জার আধুনিক ও আরও বেশি নির্ভরযোগ্য গবেষণা করেছেন। তাদের গবেষণা অনুযায়ী, আরবরা নিম্ন মানের পণ্যের বেচাকেনার সঙ্গে বেশি জড়িত ছিল। মধ্য যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চল চামড়া ও বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু আরবদের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ছিলই না বললে চলে। এ কারণে চামড়া ও বস্ত্রের ক্রেতা ছিল আরবরা। আরবে এই জিনিসগুলো পাওয়া দুষ্কর ছিল। মূল সমস্যা হল মক্কা বা আরবের কোন আন্তর্জাতিক বাজার ছিল না। অন্ততপক্ষে মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত না।

মক্কা যদি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র না হয়ে থাকে তবে ইসলামের গোঁড়ার দিকের তথ্যগুলো বানোয়াট। লেমন্স, ওয়াটস, শাবান, রেডিসন, হিট্টি, লুইস এবং শহীদের মতো অনির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ ও ওরিয়েন্টালিস্টরা মক্কাকে কেন্দ্রে রেখে বাণিজ্য রুট তৈরি করেছেন। কেননা তাদের প্রমাণ করতেই হতো মক্কা মধ্যযুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল। ইতিহাসবিদ লেমন্স প্রথম শতাব্দীর পেরিপ্লাস ও প্লিনির মতো দুর্বল ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে বারবার একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ফলে মক্কা নিয়ে গবেষণার কোন উন্নতি সাধন ঘটেনি। তার উচিত ছিল ষষ্ঠ শতকে মক্কার কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন এমন গ্রীক, বাইজেন্টাইন, এবং মিশরীয় হিস্টোরিয়ানদের রেফারেন্স ব্যবহার করা। ইতিহাসবিদেরা কোন বণিক, পর্যটক, বা ভৌগলিক নন। তাদের কাজ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। ফলে তারা তৎকালীন এলাকা

[29] Crone 1987: 53-83

ও সময় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন। এই স্বচ্ছ ধারণা পোষণকারীদের কাছ থেকেই নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া সম্ভব।

লেমন্স যদি ইতিহাসবিদদের রেফারেন্স থেকে গবেষণা চালাতেন তবে প্রথম শতাব্দীতে ভূ-মধ্য সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে গ্রীস ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে জানতেন। এর জন্য শুধু মাত্র মানচিত্রে নজর রাখলেই চলতো। সপ্তম ও ষষ্ঠ শতকের বিশ্ব মানচিত্রে কোথাও মক্কার সংযুক্তি ছিল না। মানচিত্রে মক্কা যুক্ত করা হয়েছে নবম শতাব্দীতে। নথিপত্রগুলো ঘেঁটে ৭৪১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মক্কার কোন নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ মারা যান ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। মক্কার প্রথম রেফারেন্স পাওয়া এবং মুহাম্মদের মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান ১০৯ বছর। নবম শতাব্দীতে ইবনে হায়কল প্রথমবারের মতো বিশ্ব মানচিত্রে মক্কাকে জায়গা করে দেন।

চিত্র: সপ্তম শতাব্দীর ট্রেড রুট সম্বলিত মানচিত্র

উপরের মানচিত্রটি দেখলেই বোঝা যাবে যে ভারত থেকে পানি পথের দূরত্ব অনেক নিকটবর্তী। স্থলপথের কঠিন ও দুর্গম যুদ্ধরত এলাকা কেউ অতিক্রম করতে চাইবে না। প্যাট্রিশিয়া ক্রোন এই বিষয়টি ডাইওক্লেটিয়ান রোমে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, সমুদ্র পথে ১,২৫০ মাইলের যাত্রা করতে যে পরিমাণ গম, শস্য, রসদ বা খরচ প্রয়োজন স্থলপথে তা দিয়ে মাত্র ৫০ মাইল যাওয়া সম্ভব। সমুদ্র পথে যাত্রা

অনেক সস্তা। খরচ সাশ্রয়ের জন্যই আমরা এখনও সমুদ্রপথ ব্যবহার করি। গাড়ি, গার্মেন্টস বা অন্য সব ধরণের পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য সমুদ্র পথ বেশি ব্যবহার করা হয়। আকাশ ও স্থলপথ ভীষণ ব্যয়বহুল। মধ্যযুগেও স্থলপথে যাত্রা করা ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল। স্থলপথে নিরাপত্তা দিতে হতো, উট, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি বাহনের দেখাশোনা করতে হতো। অনেক সময় পশুগুলোর খাওয়ার উপযোগী ঘাস-লতাপাতা সঙ্গে বহন করতে হতো। নিশ্চিত থাকতে হতো যেন কোন দস্যুদল এসে মরুযাত্রীদের সম্পদ লুট করে নিয়ে না যায়।

নাজরান থেকে ইয়েমেনের দক্ষিণ অঞ্চল হয়ে গাজার উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত প্রায় ১২৫০ মাইলের পথ। কেন ভারতবর্ষের বাণিজ্য তরীগুলো তাদের পণ্য অ্যাডেনের বন্দরে খালাস করে আরও ধীর গতিতে আরব মরুভূমির মধ্য দিয়ে পণ্য গাজায় নিয়ে যাবে? অথচ তারা লোহিত সাগরের পথ ধরে সহজেই আরবের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছাতে পারে। এখানে আরও একটি সমস্যা ছিল। লেমন্সের গবেষণার একটি সঠিক তথ্য হল, গ্রীক-রোমান বাণিজ্য খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকেই ধ্বসে গিয়েছিল তাই মুহাম্মদের সময়ে বাণিজ্য শুধু স্থলপথেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাণিকেরা সুমদ্রপথ ব্যাবহারের দিকে বেশী ঝুকে গিয়েছিল। উনি নিজেও স্বীকার করেছেন, তৎকালীন রেফারেন্স অনুযায়ী সাগরের বাণিজ্য রুটগুলো সবই ইথিওপিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, আরবদের না। ইথিওপিয়ার আদুলিস (Adulis) বন্দরে তখন হাতির দাঁত, চামড়া, ও দাস ব্যবসার রমরমা বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মক্কা কোন ভাবেই বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল না। আরবরা সাগরপথের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করেছে আরও পরে। তারা মরুভূমির মানুষ। উট তাদের প্রধান ও প্রিয় বাহন; জাহাজ কিংবা তরী না। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, লেমন্স গ্রীক সৌর্সগুলো সময় নিয়ে গবেষণা করলে আবিষ্কার করতেন গ্রীকদের কাছে মক্কা নামের কোন বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল না। মুসলিম মতবাদ ও ওরিয়েন্টালিস্টদের কাছে মক্কা এতই গুরুত্বপূর্ণ হলে গ্রীকরা নিশ্চয় লিপিবদ্ধ করত তারা বাণিজ্যের জন্য মক্কায় যেত। কিন্তু এ ব্যাপারে মধ্যযুগের গ্রীকদের কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। গ্রীকদের বাণিজ্য নথিপত্রগুলোতে মক্কার নিকটবর্তী তাইফ, ইয়াস্রীব উত্তরের

খায়বরের নাম থাকলেও মক্কার কোন উল্লেখ নেই। এমনকি পারস্যের সাসানিয়রা ৩০৯ খ্রিস্টাব্দের পরে ও ৫৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে আরবে বহিরাগত আক্রমণের আক্রান্ত ইয়াস্রীব ও টিহামা নগরীর নাম উল্লেখ করে; অথচ সেখানে মক্কার নাম ছিল না।

প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথের ব্যবহার কমতে থাকে এই বিষয়টি অন্যান্য ওরিয়েন্টালিস্টরা খেয়ালই করেন নি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে স্থলপথের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মক্কার প্রাচীন ধর্ম নিরপেক্ষ সূত্রগুলো ইসলামের সঙ্গে মেলে না। বরঞ্চ মক্কার প্রাথমিক অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে। এর কারণ মক্কা একেবারে কোনার দিকে ঠাসা অনুর্বর একটি অঞ্চল।

জে ভান এসের গবেষণায় জানা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধে প্রচুর জনগণ মদিনা থেকে মক্কা হয়ে ইরাকে যাত্রা করে। মক্কা নগরী মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ইরাকের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। তাই গৃহযুদ্ধের সময়ে যারা মদিনা ছেড়ে ইরাকে গেছেন তাদের মক্কার উপর দিয়েই যেতে হয়েছিল। মতবাদ অনুযায়ী ইসলামের উপাসনালয়গুলো সেসময় মদিনার উত্তরে মুখ করে ছিল। অর্থাৎ বর্তমানে মক্কার ঠিক বিপরীতে। মক্কা প্রাচীনকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিশেবে বিবেচিত হয়ে আসলে এর উপসনালয়গুলো উল্টো দিকে মুখ করে থাকবে কেন?

গবেষকরা মক্কাকে নিয়ে একটি দ্বিধান্বিত অবস্থানে ছিলেন। মক্কা যদি বাণিজ্যের কেন্দ্র না হয়ে থাকে, এটা যদি তখনকার মানুষের, বা মুহাম্মদের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শহর না হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে এটি মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র ছিল না। মক্কা না বরং ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাজেরীয়, মাঘরেই বা সারাসিনদের উপাসনার কেন্দ্র ছিল অন্য কোথাও। হিজরি নথিপত্রগুলো প্রমাণ করে মুসলিমদের ও ইহুদীদের কিবলা ও কেন্দ্র একই দিকে ছিলে। সম্ভবত ফিলিস্তিনে বা আশেপাশে কোথাও। যেদিকে ফিরে ইহুদী ও হাজেরীয়রা পাশাপাশি প্রার্থনা করত। ডোম অব দ্য রক নিয়ে আলোচনা হয়তো এ ব্যাপারে আরও কিছু কার্যকরী সূত্র দিতে পারে।

***

# ডোম অব দ্য রক ও মুসলিমদের কিবলা

আব্রাহামিক ধর্মগুলোর কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থান জেরুজালেম। ইহুদী ধর্মের উৎপত্তি জেরুজালেমে, তাদের কাছে এটি পৃথিবীর সবচাইতে পবিত্র স্থান। এটি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত নগরী। রোমান সাম্রাজ্য যখন খ্রিষ্ট ধর্মের ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, তখন রোমানরা জেরুজালেমকে নিজেদের মতো করে পুনরায় নির্মাণ করে। যুগে যুগে জেরুজালেমকে প্রতিটি ধর্মই নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী গড়ে নিয়েছে। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মরুভূমি থেকে একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের আর নিজের পয়গাম্বরের অধিকার আদায়ের দাবী নিয়ে জেরুজালেমে হাজির হয় আরবরা। তাদের কাছে জেরুজালেমে নিজেদের জন্য কোন স্থাপনা ছিল না। মুহাম্মদের মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আরবরা জেরুজালেমের পবিত্র নগরীর ধর্মীয় প্রভাবের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি কেননা, ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মুসলিমদের কাছে জেরুজালেম গুরুত্বপূর্ণ কোন নগরী ছিল না। আব্দুল মালেকই প্রথম অনুধাবন করেন আব্রাহামিক ধর্মের অধিকার আদায় করতে হলে তাকে পবিত্র নগরীতে নিজের জন্য জায়গা করে নিতে হবে। তার রাজত্বকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় নিয়ে আনতে হবে। ধর্মীয় অধিকার আদায় ও নিজের অস্তিত্বের জানান দিতেই তিনি নির্মাণ করেন ডোম অব দ্য রক।

ডোম অব দ্য রক বা কুব্বাত আল সখরা জেরুজালেমের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থিত ইসলামের সবচাইতে প্রাচীন মনোরম একটি দালান। রোমান জুপিটার মন্দিরের উপরে নতুন অবকাঠামো তুলে যে দালানটি নির্মাণ করা হয় তার সঙ্গে পুরোপুরি রোমান, কিংবা খ্রিষ্টীয় স্থাপত্যরীতির কোন মিল পাওয়া যায় না। এমনকি আরবের

ঐতিহ্যবাহী চৌকনা দালানের মতও এটি ছিল না। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আব্দুল আল মালেক এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। লক্ষ্য করার মতো একটি বিষয় হল, ডোম অব দ্য রক কোন মসজিদ না। জেরুজালেমের কেন্দ্রে অবস্থিত এত সুন্দর একটি স্থানকে কেন মুসলিমরা মসজিদ বানায় নি? অথচ পৃথিবীর সর্বত্র আগাছার মতো মসজিদ বানাতে মুসলিমদের কোন কার্পণ্য দেখা যায় না। যেহেতু ডোম অব দ্য রক কোন মসজিদ না তাই ক্বাবার মতো এটিরও কোন কিবলা নেই। এটি আটটি স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত অষ্টভুজ আকৃতির দালান। গবেষণা থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে ক্বাবার মতো ডোম অব দ্য রকও প্রদক্ষিণ করা হতো। সেকারণে এটিকে ধর্মীয় উপাসনালয় হিশেবে নির্মাণ করা হয়।[30] আব্দুল মালেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিশেবে আরব সাম্রাজ্য শাসন করছেন এর অফিশিয়াল ঘোষণা প্রদান করাই ছিল ডোম অব দ্য রক তৈরির মূল কারণ। ইসলাম ধর্মে স্থানটির গুরুত্ব তুলে ধরতে পরবর্তীতে মেরাজের ঘটনার অবতারণা করা হয়। মুসলিম ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, মেরাজের রাতে মুহাম্মদ আল্লাহ ও মুসার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ডোম অব দ্য রক থেকে সরাসরি সপ্ত আসমানে যান।

ভ্যান বারশেম এবং নেভোর ইনস্ক্রিপশনের উপরে কৃত গবেষণা থেকে জানা গেছে প্রথম দিকে অট্টালিকা নির্মাণের সময় ইনস্ক্রিপশন বা দেয়াল লিপিতে মেরাজের ব্যাপারে কিছুই লেখা ছিল না। তবে খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে কোরানের একটি আয়াত লিখা ছিল। অনেক মুসলিম ১৭:১ এবং ২:১৪৩-১৪৫ আয়াতের অংশ বিশেষ রেফারেন্স হিশেবে প্রদান করেন। উক্ত আয়াতে ‘হারাম আল শরীফ’ এবং কিবলা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। আয়াতগুলো গম্বুজের গায়ে দক্ষিণমুখী দরজার উপরে পাওয়া যাবে। কিন্তু উক্ত আয়াত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ডোম অব দ্য রকের ইনস্ক্রিপশনে খোদাই করা ছিল না। ১০১৬ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে গম্বুজ ও মসজিদ ভেঙ্গে পড়লে গম্বুজ ও মসজিদ পুরোটাই ১০২২ খ্রিস্টাব্দে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন জাহির লিজাজ। ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে দালান আবার পুনর্নির্মাণ করা হয়। কিন্তু উপরের ১৭ ও ৩৬ নং দুটো সুরারই আয়াত দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ কর্তৃক ১৮৭৬ সালে যুক্ত

[30] Glasse 1991:102

করা হয়। দরজার যে অংশে ২ নং সুরার ১৪৪ নং আয়াত খোদিত আছে তা সংযুক্ত করা হয় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে। দক্ষিণের বারান্দায় সুরা ২:১৪৩-১৪৫ নং আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক। গম্বুজের ইতিহাস বলে দুটো সুরার একটিরও আয়াত খলিফা আব্দুল মালেক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বর্তমানে ডোম অব দ্য রকের গায়ে কোরানের যতগুলো আয়াত খোদিত আছে প্রতিটিতেই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের চাইতে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদী-খ্রিস্টানরা আল্লাহর করুণা বঞ্চিত, অভিশপ্ত জাতি। প্রতিটা ইনস্ক্রিপশনই সরাসরি খ্রিষ্টান ট্রিনিটি তত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে খোদিত। এর দ্বারা মুসলিমরা জেরুজালেমের উপরে নিজেদের অধিকার ও দখলদারিত্বের ঘোষণা দেয়। মুসলিমরা বোঝাতে চায় তারা বিজয়ী, ঈশ্বরের করুণা ও যুদ্ধ লব্ধ বিজয় দুটোই তারা অর্জন করেছে।

ডোম অব দ্য রকে সর্বপ্রাচীন যে ইনস্ক্রিপশন আমরা পাই তা যীশু খ্রিষ্টের মসীহ হওয়া এবং নবীত্ব স্বীকার করে ও মুহাম্মদের ওহী প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়ার উপরে ছিল; এছাড়াও 'ইসলাম', ',মুসলিম'  শব্দ দুটো ইনস্ক্রিপশনে ব্যবহার করা হয়েছিল। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয় পারস্যের নাসির ই খুরসানের মাধ্যমে জানা যায় ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে পিলারগুলোর ডিজাইন ভিন্ন রকম ছিল। ইসলামের দাবী অনুযায়ী যদি উক্ত উপাসনালয় মুহাম্মদের জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্মৃতিরক্ষা করে চলেছে তবে ঐ স্থানের প্রাচীন ইনস্ক্রিপশনগুলোর কোথাও ঘোড়ার পিঠে চেপে রাত্রিকালীন স্বর্গ ভ্রমণের উল্লেখ ছিল না কেন? এমনকি পাঁচ বার সালাত আদায়ের হুকুমের ব্যাপারেও ডোম অব দ্য রকের গায়ে কিছু লিখা ছিল না।

এর ব্যাখ্যা কীভাবে দেয়া যেতে পারে? সম্ভাব্য উত্তর হল মেরাজ হয়ত কখনো ঘটেই নি, কিন্তু আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০ খৃষ্টাব্দের পরে) তা সম্পাদনা করা হয়। যখন আপনি জানবেন যে পাঁচবার সালাত আদায়ের হুকুম ইসলামে পরবর্তীতে যুক্ত করা হয়েছে তখন পুরো বিষয়টি বুঝতে আরও সুবিধা হবে। কোরানে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে ১১:১১৪, ১৭:৭৮-৭৯, ২০:১৩০, এবং ৩০:১৭-১৮ (উক্ত আয়াতগুলোতে 'সালাত' নাকি 'সাবাহা' আদায়ের হুকুম দেয়া হয়েছে এ নিয়ে যথেষ্ট

বিতর্ক রয়ে গেছে)। কোরানে আমরা তিন বার সালাত আদায়ের ব্যাপারে জানতে পারি। পাঁচবার সালাত আদায়ের ব্যাপারে কোরানে কিছুই লেখা নেই; অথচ মুসলিমরা এক প্রকার জোরজবরদস্তি মূলক ভোরে ও সন্ধ্যায় দুই ওয়াক্ত অতিরিক্ত সালাত আদায় করায়। মুহাম্মদ যখন মদিনায় বাস করতেন তখন মেরাজের ঘটনা ঘটে। এ সম্পর্কিত পাঁচবারের সালাত আদায়ের হাদিসগুলো সম্পাদনা করা হয়েছে ২০০-২৫০ বছর পর। পরিবর্তন ও বিবর্তনের জন্য ২৫০ বছর যথেষ্ট সময়। কোরান আল্লাহর বাণী অথচ সেখানে কতবার সালাত আদায় করতে হবে তা লেখা নেই।

ইসলামি ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, ডোম অব দ্য রকের মূল উদ্দেশ্য হল মেরাজের স্মৃতি রক্ষা করা। কিন্তু এর গায়ের শিলালিপিতে মেরাজের মহাত্ম যুক্ত হতে সময় লেগেছে ১০০০ বছর। ১০০০ বছর পর্যন্ত পুরো মুসলিম বিশ্বের কোন আলেম, রাজা-বাদশাহ, সম্রাট, দরবেশ, পীর, ফকির, কারও ভাবনায় আসেনি মেরাজের ঘটনা ডোম অব দ্য রকের গায়ে খোদাই করে রাখা উচিত। ডোম অব দ্য রক যে সময়ে নির্মাণ করা হয় তখন মক্কা কোন দর্শনীয় স্থান ছিল না। মক্কার উন্নতির জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ না করে প্রায় ৬০০ মাইল দূরে জেরুজালেমের মতো একটা স্থানে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করার চিন্তা কেন করবে খলিফা আব্দুল মালেক? কেননা আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে জেরুজালেম সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্ত হয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে আব্দুল মালেকের কাছে বিকল্প কোন রাস্তা ছিল না।

ইসলামকে একটু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই, মুহাম্মদের প্রাথমিক চিন্তা ছিল হাজেরীয়দের ইব্রাহীমের পবিত্র ভূমি, কিংবা ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের জন্ম অধিকার পুনরুদ্ধার করা। খলিফা আব্দুল মালেক জেরুজালেমে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে সেটা পূরণেরই চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা তার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের উপরে গম্বুজ স্থাপনের কাজ তদারকি করেন। ইসলামের ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, খলিফা সুলাইমান (৭১৫-৭১৭ খ্রিস্টাব্দ) একবার মক্কা গিয়েছিলেন হজ্জের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নিতে। মক্কায় গিয়ে হজ্জ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এরপর

খলিফা সুলাইমান খলিফা আব্দুল মালেককে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি ডোম অব দ্য রকে যাত্রা করেন। খলিফা সুলাইমানকে অনেক মুসলিম স্কলাররা ইমাম মালিক বিন আনাস ভেবে ভুল করেন। ইমাম মালিক ৭১২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র তিন থেকে পাঁচ বছর বছর বয়সে তার পক্ষে মক্কা থেকে জেরুজালেম ভ্রমণ সম্ভব না। স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ড. হটিং এ ব্যাপারে বলেছেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রধান উপাসনালয় কোথায় ছিল বা হজ্জ কোথায় করতে হবে তা নিয়ে খোদ মুসলিমরা বিভ্রান্ত ছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র হিশেবে পরিচিত মক্কা ইসলাম সৃষ্টির অনেক পরে আত্ম-প্রকাশ করে।

আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ তথ্যের জন্য আমরা কিছু সময় পেছনে চলে যাচ্ছি। খলিফা আব্দুল মালেকের ঠিক পরপরই খলিফা প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) ফরমান জারি করেন ইসলামী বিশ্বের সমস্ত মসজিদ ভেঙে ফেলে বর্ধিত করতে হবে।[31] তখনই মক্কাকে কিবলা হিশেবে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। মধ্যযুগে ক্বাবা ও ওয়েস্ট কোস্টে মক্কার বাণিজ্যিক কোন গুরুত্ব ছিল না। ভারত বর্ষ থেকে আগত সমস্ত মালবাহী জাহাজের গন্তব্য ছিল আফ্রিকা। অনেক মুসলিমদের মাঝে হজ্জের স্থান নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। সেই সঙ্গে মক্কাও অনেক পরে মানচিত্রে যুক্ত করা হয়। এখন প্রশ্ন হল প্রাচীনকালে মক্কা যদি গুরুত্বহীন একটি নগরী হয়ে থাকে তাহলে ক্বাবা ও কিবলার কী হবে? কিবলাই তো প্রতিটা মুসলিমের প্রার্থনার দিক। কোরানের ২:১৪৫ নং আয়াতে মক্কাকেই মুসলিমদের একমাত্র প্রার্থনার দিক নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কোরানই আবার ভিন্ন বর্ণনা দিচ্ছে; ইসলামের শুরু থেকে মক্কা মুসলিমদের জন্য একমাত্র কিবলা ছিল না। কোরান সাক্ষ্য দেয়, শুরুতে মুসলিমরা জেরুজালেমকে কিবলা নির্ধারণ করে নামাজ আদায় করত। কিন্তু জেরুজালেম থেকে দিক বদলে মক্কায় অবস্থিত ক্বাবাকে মুসলিমদের প্রার্থনার দিক নির্ধারণ করা হয় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে। অতএব, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের পর নির্মিত পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদের

[31] Kitab al- ’uyun wa’l hada’iq: Edited by M de Goeje and P de Jong 1869:4

মিহরাব মক্কার দিকে ঘোরানোর কথা। এছাড়া ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের আগে মুসলিমদের কোন মসজিদ ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু ইসলাম অনুসারী বাদে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ লাভান্ত এলাকায় মুসলিমদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে মক্কা-মদিনার বাহিরে মুসলিমরা ব্যাপক হারে হিজরত শুরু করেনি। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের পরেই মুসলিমরা বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, জেরুজালেম জয় করে। সে সময় কিবলা মক্কা অভিমুখে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মুসলমানদের প্রাচীন মসজিদগুলো প্রমাণ দিচ্ছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ৮০-৯০ বছর পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা ছিল অন্য কোথাও।

ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মুসলিমদের প্রার্থনার দিক আরও অনেক উত্তরে অর্থাৎ আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল। সপ্তম শতকে প্রথম ভাগের মসজিদগুলোর উপরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে এই প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্রসওয়েল ও ফেহভারির মধ্য প্রাচ্যের মসজিদগুলো নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে বেড়িয়ে আসে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য। ইরাকে উমাইয়াহ শাসন আমলে নির্মিত দুটো মসজিদের ফ্লোর প্ল্যান বা মেঝের পরিকল্পনা দুই ধরণের। ওয়াসিত ও কুফা মসজিদ নামের মসজিদ দুটো ৬৭০ খ্রিস্টাব্দ অতবা অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে নির্মাণ করা হয়। ওয়াসিত মসজিদ সম্পর্কে ক্রসওয়েল লিখেছেন, *'...the oldest mosque of which remains have come down to us.'*[32] বাগদাদের নিকটে কুফা মসজিদও একই সময়ে নির্মাণ করা হয়। কুফা মসজিদের মেহরাব বা কিবলা মক্কার দিকে ছিল না বরং তা আরও উত্তর দিকে ঘোরান ছিল। ওয়াসিত মিসজদের কিবলা প্রায় ৩৩° এবং কুফা মসজিদের কিবলা প্রায় ৩০° উত্তরে ঘোরানো ছিল।

এই আবিষ্কারটি নবম শতকের মুসলিম ইতিহাসবিদ বালাধুরির বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। তিনি 'কিতাব ফাতাহ আল বালদান' রচনা করেন। প্রাচীন মুসলিম বিজয় গাঁথা নিয়ে সাহিত্য রচনা উক্ত গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। বালাধুরি স্বীকার করেছেন যে, *কুফার প্রথম মসজিদের কিবলা ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয় এবং তা পশ্চিম দিকে*

[32] Croswell 1989:49

*ঘোরানো ছিল। কিন্তু কুফার প্রাচীন মসজিদের কিবলা ঘোরানো দরকার ছিল দক্ষিণ দিকে।*[33]

এছাড়া কায়রোর অদূরে সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত আমর ইবনে আল আস মসজিদ ও ফুশতাত মসজিদের একই ধরণের ফ্লোর প্ল্যান লক্ষ্য করা যায়। মসজিদটির ফ্লোর প্ল্যান উত্তর দিকের তুলনায় অনেক ঘোরানো ছিল। গভর্নর কুরা বিন শারিক কর্তৃক তা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়। মজার ব্যাপার হল এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন ইসলামী গবেষক আহমেদ ইবনে মাকারাজি। তিনি বলেন, আমর মসজিদ পুরোপুরি দক্ষিণ দিকে না, দক্ষিণ-পূর্বদিকে ঘোরানো ছিল। একটি মানচিত্র বা নকশা হাতে নিলে যে কেউ বুঝতে পারবে মসজিদের কিবলা কোন দিকে আছে। উপরে বর্ণনাকৃত কোন মসজিদেরই কিবলা মক্কার দিকে না বরং আরও উত্তরের দিকে ছিল। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মসজিদগুলো ছিল জেরুজালেম বা পেত্রার দিকে মুখ করা।

চিত্র: কুফা, ওয়াসিত ও ফুশতাত মসজিদের কিবলা ও কাবার অবস্থান

খ্রিষ্টান লেখক জেকব অব এডিসা ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। তিনি মুসলিমদের মাঘরেই বলে উল্লেখ করেন এবং তাদের ব্যাপারে বলেন, *"So from all this it is clear that it is not to the south that the Jews and the*

[33] Al- Baladhuri Futuh Ed. By de Goeje 1866: 6; Crone & Cook 1979: 24:13

*Mahgraye here in the regions of Syria pray, but towards Jerusalem or the Ka'ba, the patriarchal places of their races."*[34] জেকব অব এডিসা কর্তৃক ক্বাবা উল্লেখ করার অর্থ এই না যে, তিনি মক্কাকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা সেই সময় আরও অনেক ক্বাবা ছিল। বিশেষ করে বাজার ও নগরীতে।[35] ক্রসওয়েল তার বই Early Muslim Architecture-এর ১৭ পৃষ্ঠার নোটে লিখেছেন, *ফিনিস্টার তার আর্টিকেল Kunst des Orients-এ বর্ণনা করেছেন, প্রাক ইসলামী যুগে আরবের ঐতিহ্যবাহী সব দালানই ছিল চৌকোণা। চৌকোণা দালানকে আরবিতে ক্বাবা বলা হয়। কিন্তু অন্য চৌকোণা দালানগুলোর থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট দালানের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করতে গিয়ে আরবি সাহিত্যে ক্বাবা শব্দটি বিশেষ স্থান দখল করে নেয়।*[36] প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা নগরের বাজারের মাঝখানে বড়সড় একটি ক্বাবা নির্মাণ করে তাতে মূর্তি ঢুকিয়ে পৌত্তলিকতার চর্চা হিশেবে একটি মন্দির তুলে দেয় যেন সেখানে লোকজন তীর্থে এসে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে পারে। ধর্ম ব্যবসার জন্য এখন পর্যন্ত এটি সর্ব উৎকৃষ্ট লাভজনক পদ্ধতি। আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাবে। জেকব অব এডিসা ক্বাবাকে আরব জাতির পিতৃভূমি বা 'patriarchal places of their races' বলে উল্লেখ করেছেন; তিনি এও বলেছেন এই ক্বাবা দক্ষিণে অবস্থিত না। কিন্তু জেকবের অবস্থান থেকে ভৌগলিক দিক দিয়ে মক্কার ক্বাবা ছিল দক্ষিণ দিকে। আরব ও ইহুদী দুটো মতবাদ অনুযায়ীই মাঘরেই ও ইহুদীদের পিতা ইব্রাহীম প্যালেস্টাইনে বাস করতেন এবং সেখানেই মারা গেছেন। জেকব অব এডিসা মাঘরেইদের প্রার্থনার দিক সেদিকেই বর্ণনা করেছেন। অতএব জেকব অব এডিসার বর্ণনা মোতাবেক বলা যায় ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে কিবলা হিশেবে মক্কা তখনও সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়েছিল না। ড. ক্রোন ১৯৯৪ সালে লিখিত একটি আর্টিকেল The First-Century concept of Higra-এ মুহাম্মদের মৃত্যুর দীর্ঘদিন

---

[34] Wright 1870:604 Crone-Cook 1977:24
[35] Crone-Cook 1977:25,175
[36] Creswell 1969:17; Finster 1973:88-98

পরও মুসলিমদের কিবলা জেরুজালেমে হওয়ার আরও একটি প্রমাণ যুক্ত করেন। প্যাট্রিশিয়া কার্লারের সঙ্গে গবেষণা করতে গিয়ে প্যাট্রিশিয়া ক্রোন এই তথ্য প্রমাণ খুঁজে পান।[37] উমাইয়া খিলাফত শাসন আমলে মরুভূমির মাঝে অবস্থিত গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের মসজিদগুলোর কিবলা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে ছিল। ড. হটিং মুসলিমদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, সপ্তম শতাব্দীর কোন মসজিদেরই কিবলা মক্কার দিকে পাওয়া যায়নি। হটিং এর দাবী, সবগুলো মসজিদের কিবলা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে ছিল না। কিছু ছিল পেত্রার দিকে; কিছু জেরুজালেম, মক্কার ও পেত্রার মাঝ বরাবর। উত্তর আফ্রিকার মসজিদগুলো দক্ষিণ দিকে মুখ করে ছিল। এর ফলে মুসলিমদের প্রাথমিক যুগের উপাসনালয়ের অবস্থান নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ড্যান গিবসন আরও প্রমাণ সহ এই ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এর জন্য তিনি স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি ব্যবহার করেন। ড্যান গিবসনের ছবিগুলোতে আমরা দেখতে পাই, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্বের অনেক মসজিদ মক্কার দিকে না বরং পেত্রার দিক মুখ করে আছে। ড্যান গিবসনের স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিগুলো আমরা নিচে যুক্ত করেছি।

চিত্র: গ্রেট মস্ক অব গুয়াংঝু, চীন; নির্মাণ: ৬৩০

---

[37] Carlier 1989:118f, 134; Crone 1994:387
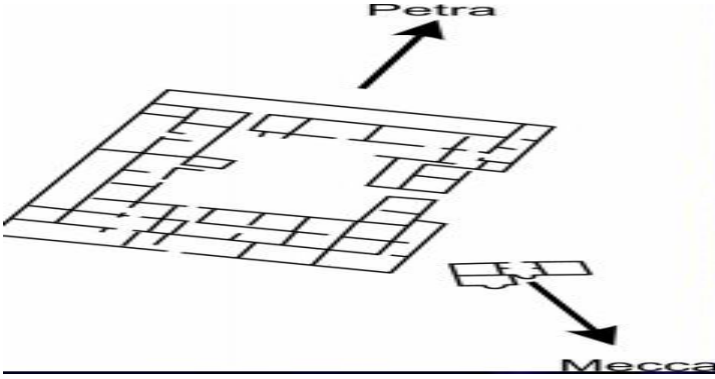
চিত্র: হুমেইমা মসজিদ, দক্ষিণ-পশ্চিম জর্দান; নির্মাণ: অজানা
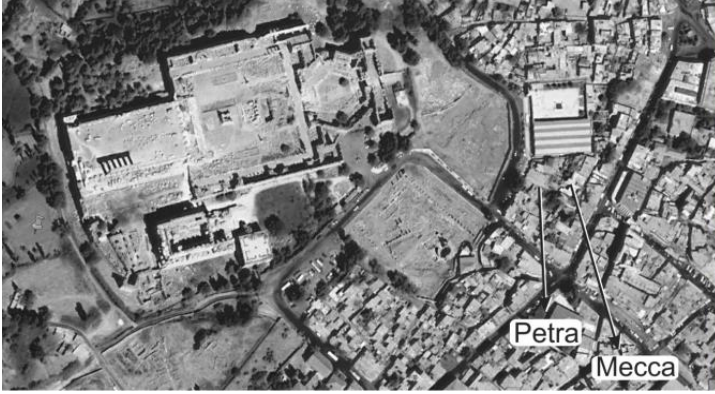
চিত্র: গ্রেট মস্ক অব বলবেক, লেবানন; নির্মাণ: ৭০৫ খ্রিষ্টব্দ

চিত্র: গ্রেট মস্ক অব সানাই, ইয়েমেন; নির্মাণ: ৭০৫
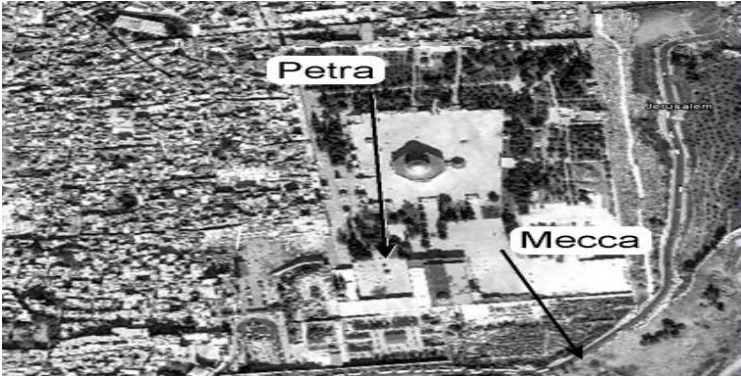
চিত্র: আল আকসা মসজিদ, জেরুজালেম (৭০৯) জেরুজালেম
সিটাডেলের কোন বিল্ডিংই মক্কার দিকে ঘোরানো নেই।
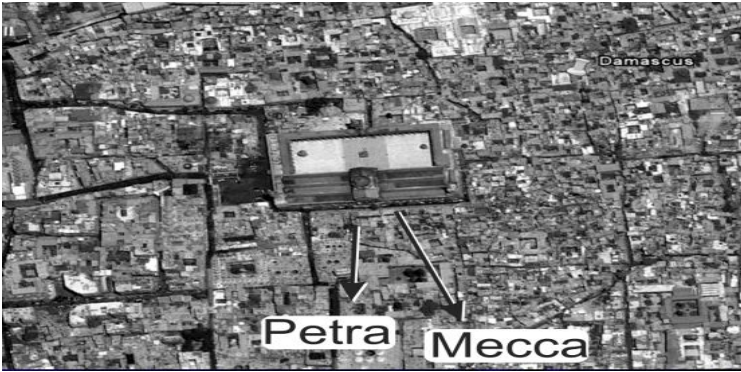
চিত্র: দামেস্ক মসজিদ, দামেস্ক নির্মাণ: ৭০৯

চিত্র: আনজার মসজিদ, বৈরুত নির্মাণ: ৭১৪

চিত্র: উমর মসজিদ, বসরা, সিরিয়া, নির্মাণ: ৭২০

চিত্র: বানভোর, পাকিস্তান নির্মাণ: ৭২৭
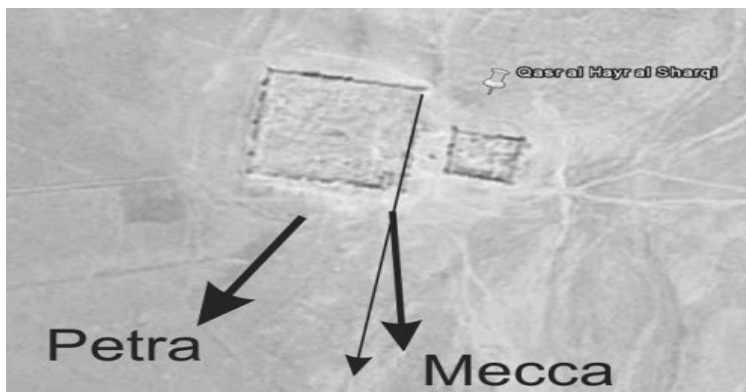
চিত্র: কাসার আল হায়ার আল শারকি, সিরিয়া নির্মাণ: ৭২৮
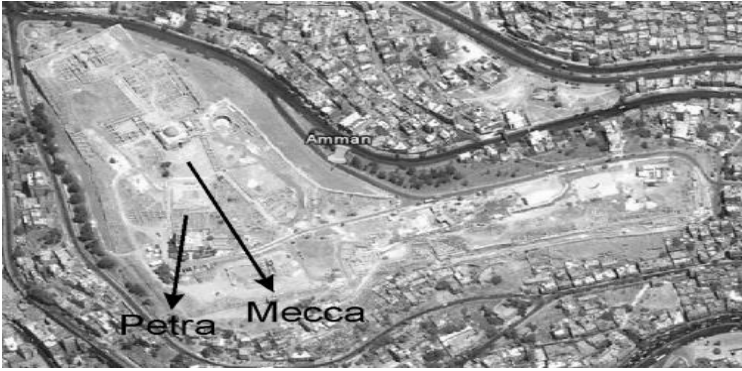
চিত্র: আম্মান মসজিদ, ৭০০ খ্রিস্টাব্দের ফ্লোর প্ল্যানে কিবলা ছিল পেত্রার দিকে, ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি পুননর্নির্মাণ করে কিবলামক্কার দিকে ঘোরান হয়
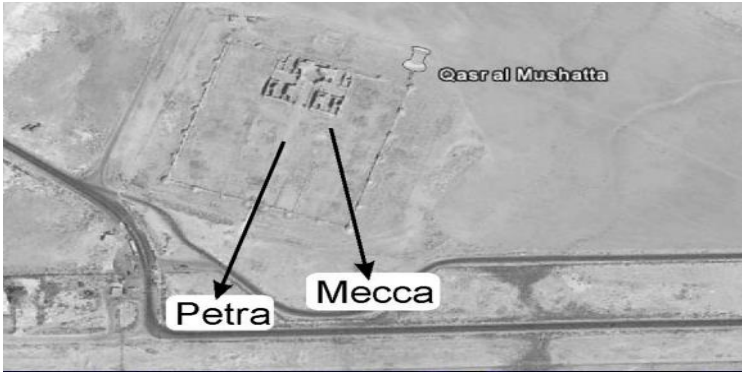
চিত্র: মুশাত্তা মসজিদ, আম্মান নির্মাণ: ৭৪৩

চিত্র: সুসার রিবাত দূর্গ, তিউনেশিয়া; নির্মাণ: ৭৭০

চিত্র: কার্ডোভা, স্পেন; নির্মাণ: ৭৮৪ চিত্র: সুসার রিবাত দূর্গ, তিউনেশিয়া; নির্মাণ: ৭৭০

চিত্র: গ্রেট মস্ক অব কায়রোয়ান, তিউনেশিয়া, নির্মাণ: ৮১৭

চিত্র: ড্যান গিবসন যে সমস্ত এলাকার মসজিদ নিয়ে গবেষণা করে পেত্রার দিকে কিবলা পেয়েছেন

উপরের ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে ৭২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সবগুলো মসজিদের কিবলা পেত্রার দিকে ঘোরানো। ৭২৫ থেকে ৮২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিছু মসজিদের কিবলা পেত্রা এবং কিছু মসজিদের কিবলা মক্কার দিকে ঘোরান; এবং মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত, অর্থাৎ ৮২২ খ্রিস্টাব্দের পর সকল মসজিদের কিবলা নির্মাণ করা হয় মক্কার দিকে। কিছু মসজিদ পরবর্তীতে পুনর্নির্মাণ করে কিবলা মক্কার দিকে ঘোরানো হয়। আম্মানের মুশাত্তা মসজিদের কিবলা এখনও পেত্রার দিকে রয়েছে। তিউনেশিয়ার বিরাত সুসা, কার্ডোভা মসজিদ, তিউনেশিয়ার বাইরোয়ান মসজিদের কিবলা মক্কা ও পেত্রার মাঝামাঝি অবস্থান করছে। নিচে একটি ছক তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ড্যান গিবসন এখন পর্যন্ত যতগুলো মসজিদ নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি পেয়েছেন সেই মসজিদগুলো সাল অনুযায়ী কত শতাংশ কোন দিকে কিবলা ঘোরানো ছিল।

| ১০০% মসজিদের কিবলা পেত্রার দিকে (যে সমস্ত মসজিদগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে) | ১২% পেত্রার দিকে<br>৫০% মক্কার দিকে<br>৩৮% মক্কা ও পেত্রার মাঝামাঝি | ১০০% মসজিদের কিবলা মক্কার দিকে |
|---|---|---|
| পেত্রা | পেত্রা ও মক্কা | মক্কা |
| ০১ - ১০৭ হিজরি<br>৬২২ - ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ | ১০৭-২০৭ হিজরি<br>৭২৫-৭২২ খ্রিষ্টাব্দ | ২০৭ হিজরি- বর্তমান<br>৮২২ খ্রিষ্টাব্দ- বর্তমান |

তাহলে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১০০ বছর পর্যন্ত দূর প্রাচ্য থেকে শুরু করে আফ্রিকার সবগুলো মসজিদের কিবলা পেত্রার দিকে ঘোরানো ছিল। কিন্তু পেত্রায় কেন? পেত্রায় কী এমন ছিল? বিশ্ব সভ্যতায় পেত্রার গুরুত্ব অসীম। প্রাচীন কালে পেত্রা শুধু পৌত্তলিকদের উপাসনার কেন্দ্রই ছিল না পুরো বিশ্বের বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। পেত্রা সমাধি এবং মন্দিরের নগরী। পেত্রা অন্য যেকোনো প্রাচীন শহরগুলোর মাঝে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৯,০০০ বছর আগে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ আব্রাহামিক ধর্মগুলোর জন্মেরও দ্বিগুণ পূর্বে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে এটি নাবাতিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে যায়। নাবাতিয়রা ছিল বেদুইন, যাযাবর, আরব গোষ্ঠী। এরা আক্ষরিক অর্থে মরুভূমিতে হিজরত করে বেড়াত। যেখানে তৃণভূমি ও পানির দেখা পেত সেখানে বসতি গড়ে তুলত। নাবাতিয়া ওরিয়েন্টাল ট্র্যাডিশন বা মৌখিক প্রথায় বিশ্বাস করত তাই তাদের কোন ঐতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় না। তাদের বিনিয়োগের উপরে ভর করেই পেত্রার বাণিজ্য পথগুলো গড়ে ওঠে ইউরোপ, আফ্রিকা, ও দক্ষিণ এশিয়ার মাঝে। লেনদেনের উপরে অর্জিত রাজস্ব থেকেই পেত্রা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যাযাবর মানব জাতি যখন ট্রাইগ্রিস, নীলনদ, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, ইয়েলো ও ইয়াংঝু নদী তীরে একত্রিত হয়ে সভ্যতার ভিত্তি তৈরি করছিলো তখন পেত্রা ইতোমধ্যে সবকিছুর কেন্দ্রে পরিণত হয়। উক্ত সভ্যতাগুলো বিকাশের পূর্বেই পেত্রাবাসী পণ্যের লেনদেন করা শিখে ফেলেছিল। প্রাচীন কালে দীর্ঘ দূরত্বের ব্যবসা এবং সঞ্চার ছিল শহুরে সভ্যতা উত্থানের সবচাইতে কার্যকরী জিনিস। কেননা এর মাধ্যমেই এক অঞ্চলের জ্ঞান আরেক অঞ্চলে লেনদেনের ফলে দ্রুত মানব সভ্যতা বিকশিত হয়ে ওঠে। রথ আবিষ্কারের মাত্র সাত হাজার বছরের মধ্যে আমরা পাড়ি জমাই মহাকাশে। মানুষ একে অপরের সভ্যতার সঙ্গে লেনদেনের জন্য যে পথ নির্মাণ করেছিল সেটিই ভবিষ্যতে গিয়ে ট্রেড রুটে পরিণত হয়। যে সমস্ত অঞ্চল এই ট্রেড রুটের অভ্যন্তরে পড়ত সেগুলোই সভ্য জগতের মিছিলে দ্রুত উন্নত করতে থাকে এবং বাকিগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন জগত।
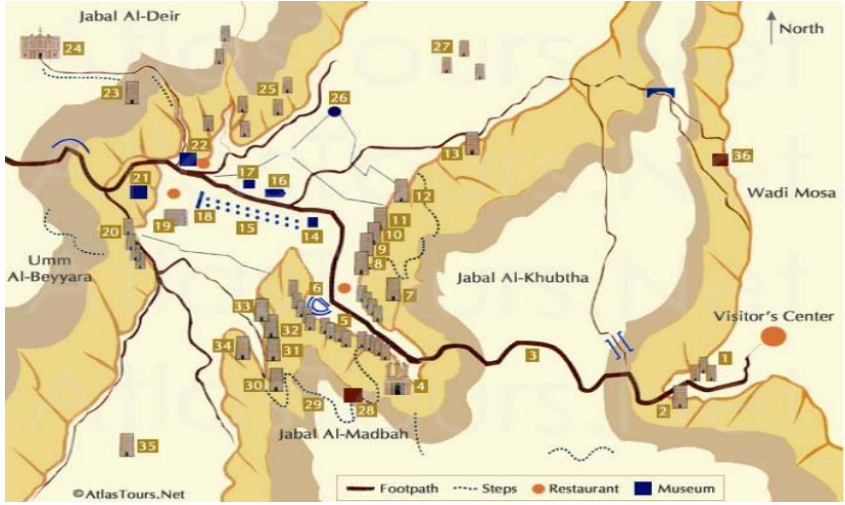
চিত্র: পেত্রার বর্তমান ম্যাপ

আরবদের পূর্বপুরুষ হলেন নাবাতিয়রা। আরবের যত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, জেনেটিক মিউটেশন সবই এসেছে নাবাতিয়দের কাছ থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পেত্রা নগর সক্রিয় ছিল। পৌত্তলিকদের সমস্ত উপাসনার কেন্দ্র ছিল পেত্রা। সেক্যুলার হিস্টোরিয়ানদের মতে ইসলাম  হল পৌত্তলিক ধর্মের বর্ধিত ও আব্রাহিক রূপ। পৌত্তলিক অনেক উপাদান যেমন ইসলামের বেসিক প্রিন্সিপলগুলোতে পাওয়া যাবে তেমন এটিকে পুরোপুরি আব্রাহামিকও বলা সম্ভব না। তাদের ধারণা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে সমস্ত মসজিদের কিবলার দিক পেত্রায় হওয়ার কারণ হল পেত্রার গুরুত্ব ছিল অসীম। পেত্রাকে যদি খুঁটিয়ে দেখা যায় তবে বেড়িয়ে আসে পেত্রা পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। পেত্রার মাঝ বরাবরও আরও একটি উপত্যকা রয়েছে। এখানে গাছ, মাটি, ঘাস, কাদামাটি, দোআঁশ মাটি এমনকি মাঝ দিয়ে জল প্রবাহ বয়ে গেছে। পেত্রার পাশে পিলার অব সল্ট রয়েছে যা নবী মুহাম্মদ সকাল ও সন্ধ্যা যাওয়া আসার সময় দেখতে পেতেন।[38] কোরানে অবস্থিত মক্কার সকল বর্ণনার সঙ্গে পেত্রার মিল পাওয়া যায়। এর ঠিক পাশেই প্রাচীন আদ ও সামুদ জাতির

[38] Sura: 37:136-138

বাসস্থান। পেত্রার আরবি নাম বাত্রা। এর সঙ্গে কোরানে বর্ণিত বাক্কার মৌলিক বর্ণগুলোর মিল পাওয়া যায়।

ক্রোন, কুক, কার্লার, হটিং সবার গবেষণার একটিই ফলাফল, ইরাক ও সিরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ; মিশরের পুঁথিগত প্রমাণ দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করছে যে মুসলিমদের উপাসনালয় দক্ষিণদিকে ছিল না, অন্তত পক্ষে সপ্তম শতাব্দীর শেষ নাগাদ তো নয়ই। এখানে আসলে কী ঘটেছে? কেন কিবলাগুলো মক্কার দিকে নেই? কেন ৭০৫ খ্রিস্টাব্দেও কোরানের সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের এত বেশি অমিল?

বর্তমান সময়ের মুসলিমরা যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবে, প্রাচীন মুসলিমরা হয়ত মক্কার দিক জানত না কিংবা দিক নির্ণয়ে ভুল করে ফেলেছে। এই ধরণের যুক্তি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আরবরা ছিল মরুভূমির ব্যবসায়ী, মরুযাত্রী। তাদের বেঁচে থাকা না থাকা নির্ভর করত মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর উপর। প্রাচীনকালে খুব কম ল্যান্ড মার্ক ছিল। মরুঝড়ের জন্য বালির উপর কোন পথই টিকে থাকত না। এসব কারণে আরবরা নক্ষত্র দেখে পথ চলত। নক্ষত্র দেখে পথ চলার উপরেই তাদের রুটি-রুজি নির্ভর করত। বালির রাজ্যে নক্ষত্রের সাহায্যেই তারা মরূদ্যান খুঁজে বের করত। নিশ্চিত ভাবেই আরবরা উত্তর-দক্ষিণের পার্থক্য জানত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উক্ত মসজিদগুলো কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠেনি। তৎকালীন পৌর অঞ্চলেই মসজিদগুলো নির্মিত হয়। ঐ সমস্ত শহরে বাস্তব বোধ সম্পন্ন যেকোনো মানুষের পক্ষে দিক নির্ণয়ে পারদর্শী হওয়ার কথা। তারা কিবলার দিক নির্ণয় ভুল করবে এটি অসম্ভব একটি ব্যাপার। কিন্তু কেন মুসলিমরা উত্তর আরবের দিকে ঘুরিয়ে কিবলা নির্ধারণ করল? সমাধানটা হয়ত অন্য কোথাও লুকানো আছে। কিন্তু কিবলা নির্ণয়ের অমিল হওয়ার পেছনে দু’টি কারণ থাকতে পারে:

ক) মুসলিম ও ইহুদীদের মাঝে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সু-সম্পর্ক বজায় ছিল। ফলশ্রুতিতে মুসলিম ও ইহুদীরা একই সঙ্গে একই দিকে ফিরে প্রার্থনা করত ফলে কিবলা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয়নি।

খ) কিবলা হিশেবে মক্কা খোদ মুসলিমদের কাছেই পরিচিত ছিল না।

কোরানের ভাষ্য মতে মুহাম্মদ ৬২৪ (মতান্তরে ৬২২) খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের সঙ্গে সকল ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। একই সময়ে কিবলাও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু প্রাচীন অমুসলিম উৎসগুলো মুসলিমরা যখন যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করছিল তখন মুসলিম ও ইহুদীদের মাঝে সু সম্পর্কের বর্ণনা করে। উদাহরণ হিশেবে ইসলামিক বর্ণনার বাহিরে প্রাপ্ত মুহাম্মদের সর্বপ্রাচীন রেফারেন্সের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জেরুজালেম বিজয়ের সময় ৬৩৪ থেকে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে কোন এক সময় একজন ইহুদী বিরোধী গ্রীক লেখক ডকটোরিনা জেকবি নামে একটি ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। ইসলামের কথিত ইতিহাসের সঙ্গে এর বেশ অমিল লক্ষ্য করা যায়। তিনি লেখেন, *'ইহুদীরা সারাসিনদের সঙ্গে এক হয়েছে এবং জীবন ও সম্পদ সারাসিনদের হাতে ধ্বংস হচ্ছিল।*[39] এছাড়াও একটি প্রাচীন আর্মেনিয়ান বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইহুদী মুসলিমদের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে যুদ্ধ অভিযানের ফল স্বরূপ একজন ইহুদীকে জেরুজালেমের গভর্নর পদে বসানো হয়।[40] সর্বোপরি ডকটোরিনা জেকবির বর্ণনা থেকে আমরা ভিন্ন রকম কিছু তথ্য পাই: *সারাসিনদের হাতে বাইজেন্টাইন সেনাপতি ক্যান্ডিটাস নিহত হওয়ার সময় আমি কৈসরিয়ায় একটি নৌকায় উঠে সিকামিনা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। লোকে তখন বলাবলি করছিল 'ক্যান্ডিটাস মারা গেছেন' এবং আমরা ইহুদীরা আনন্দ-উৎসব করছিলাম। তারা বলছিল যে সারাসিনদের সঙ্গে একজন পয়গাম্বরও এসেছেন। উনি নিজেকে খৃষ্টের আবির্ভাব হিশেবে দাবী করেছেন। আমি সিকামিনায় পৌঁছলাম। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা হয় আমার। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সারাসিনদের সঙ্গে আসা পয়গাম্বরের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন আপনি?' উনি গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'সে মিথ্যা পয়গাম্বর। কোন পয়গাম্বরই তরবারি হাতে নিয়ে আসে না। নিঃসন্দেহে ওরা আজ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে; এবং যেদিন খৃষ্ট আসবেন উনি খ্রিষ্টানদের সেবা করবেন এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হবেন। অথচ এখানে আমাদের যিশু খৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করার*

---

[39] Bonwetsch 1910:88
[40] Patkanean 1879:111; Sebos:1904:103

*প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। নিশ্চয় ইসাইয়া বলেছেন, ইহুদীরা কেয়ামত পর্যন্ত বিকৃতমনা ও পাষাণ হৃদয় হয়ে থাকবে। কিন্তু আপনি যান প্রভু ইব্রাহীম। গিয়ে যে পয়গাম্বর এসেছে তার ব্যাপারে খোঁজ নিন।' তাই আমি, ইব্রাহীম তথাকথিত পয়গাম্বরের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানলাম এসবের কিছুই সত্য না। শুধু মানুষের রক্তের দাগ। তিনি বলেছিলেন তার কাছে স্বর্গের চাবি থাকবে, যা আশ্চর্যজনক।*[41]

দুটি বিষয় এখানে খুব গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, ইহুদী এবং আরবরা একযোগে প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে ও পরবর্তীতে কিছু সময় তারা একে অপরের মিত্র ছিল; এবং মুহাম্মদ তখনও জীবিত ছিলেন। মুহাম্মদের জীবিত থাকার আরও একটি রেফারেন্স আমরা পাই, Fragment of Arab-এ। দামেস্কর ইয়ামূক যুদ্ধে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরবের মুহাম্মদকে জীবিত দেখতে পাওয়ার দাবী করা হয়। মুহাম্মদের জীবিত থাকার রেফারেন্স গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ণ হল আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের সখ্যতা। ডকটোরিনা জেকবির তথ্য অনুযায়ী আরব-ইহুদী ঘনিষ্ঠতা খ্রিষ্টানদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বনওয়েশ এর মতে, একজন ধর্মান্তরিত ইহুদী কিছুতেই অস্বীকার করেনি যীশু ঈশ্বরের একজন পুত্র এর জন্য ইহুদী-আরবরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আরব ইহুদী মিত্রতা তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায় সিরাতুল মুহাম্মদের মহান লেখক ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে। তার গুরুত্বপূর্ণ নথি 'দস্তুর আল মাদিন' বা 'কনস্টিটিউশন অব মদিনা'তে বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা মুসলিম উম্মার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করত এবং এর জন্য তাদের স্বজাতিরা বেনামী আরব গোত্রের প্রতি দ্বেষ পেষণ করছে। ক্রোন এবং কুকের মতে, দস্তুর আল মাদিন ইসলামী নথিরগুলোর মাঝে সবচে প্রাচীন একটি শাস্ত্র।

যদি ঐ প্রত্যক্ষদর্শীরা সঠিক হয়ে থাকেন তবে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ও ইহুদীরা একে অপরের মিত্র ছিল যেখানে কোরান বলছে মুহাম্মদ ইহুদীদের সঙ্গে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করেন ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে। তাহলে ১৫ বছর তারা এক সঙ্গে কীভাবে থাকলো? এর উত্তর রয়েছে আনুমানিক ৬৬০ খ্রিস্টাব্দের বিশপ সেবওয়েস কর্তৃক

---

[41] Doctorina Jacobi: v. 16.209 (1057)

লিখিত একটি আর্মেনিয়ান ক্রনিকলে। এখানে বর্ণিত রয়েছে মুহাম্মদ কীভাবে ইব্রাহীমের বংশধরদের দোহাই দিয়ে আরব ও ইহুদীদের এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কেননা আব্রাহামিক ধর্মের মূল উপজীব্যই হল আরবরা ইসমাইলের বংশধর, এবং ইহুদীরা ইসহাকের বংশধর। ক্রনিকল মোতাবেক উক্ত সম্প্রদায়কে মুহাম্মদ তাদের জন্ম অধিকার পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জেনেসিসে বর্ণিত রাব্বাহ ব্যাবিলনিয়ান তামুদ এবং বুক অব জুবিলিসে ইসমাইলকে তার জন্ম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ফলে ইহুদীদের সঙ্গে সখ্যতা ছাড়া প্যালেস্টাইনে ফেরত যাওয়া সম্ভব না।

শুধু আরব না, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়াতেও কব্জা করা মুহাম্মদের স্বপ্ন ছিল। আবু দাউদ সুলাইমান বিন আল আসাদ আল সিজিস্তানি এবং আহমেদ বিন মুহাম্মদ ইবনে হানবাল বর্ণনা করেছেন, নবী বলেছেন, *আল্লাহর মনোনীত গোলামদের জন্য তিনি সিরিয়াকে পছন্দ করেছেন।*[42]

উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, আরবের মূল হিজরত আসলে মক্কা ও মদিনার কোন নির্দিষ্ট গোত্রের মাঝে হয়নি। মুহাম্মদ জেরুজালেমের আশেপাশে কোন অঞ্চলে বাস করতেন, সম্ভবত পেত্রার নিকটে। তিনি বনী ইসমাইলি আরব ও ইহুদীদের সঙ্গে নিয়ে পেত্রা থেকে অন্য কোথাও হিজরত করেছেন। টম হল্যান্ড তার ডকুমেন্টারি ‘ইসলাম: দ্যা আনটোল্ড স্টোরি’তে ড. প্যাট্রিশিয়া ক্রোনকে প্রশ্ন করেন, মুহাম্মদ কোথা থেকে এসেছিল বলে আপনার ধারণা? তিনি জবাব দেন, মুহাম্মদ আর যাই হোক মক্কা থেকে আসেন নি। আদৌ কোথা থেকে এসেছেন এর কোন শক্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না।

আরব ও ইহুদীদের মাঝে ভাঙ্গন জেরুজালেম জয়ের অনেক পরে আনুমানিক ৬৬০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় ঘটেছিল। অ-মুসলিম বর্ণনা মোতাবেক কোরানে সম্পর্ক ছিন্নের দাবী করার পর প্রায় ১৫ বছর পর্যন্ত আরব ও ইহুদীদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকে। এও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আরবদের চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল প্যালেস্টাইন তথা

---

[42] Abu Dawud 1348:388; Ibn Hanbal 1313:33f

জেরুজালেমে স্থায়ী হওয়া, মক্কায় না। মক্কাকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় করা হয় অনেক পরে খলিফা আব্দুল মালেকের হাত ধরে। ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের নেস্টোরিয়ান যাজকের নথি অনুযায়ী হিজরত শুধু মদিনায় ছিল না বরং প্রতিশ্রুত ভূমি সম্ভবত আরবের বাহিরে কোথাও ছিল। এ ব্যাপারে আবু দাউদ আরও স্পষ্ট তথ্য দেন, *"Therer will be 'hijra' after 'hijra' but the best of men are follow the 'hijra' of Abraham".*[43] প্যাট্রিশিয়া ক্রোন তার আর্টিকেলে ৫৭টি রেফারেন্স দেখিয়েছেন যেখানে মক্কা ও মদিনার মাঝে হিজরত না বরং আরব থেকে উত্তরে অথবা গ্যারিসন এলাকায় হিজরতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। নবম শতাব্দীর পরে তার বায়োগ্রাফি লিখিত হয়। অষ্টম শতকের পূর্বেও তার জন্ম শহর মক্কার কোন উল্লেখ ছিল না। মুহাম্মদের সম্পর্কে আমরা বর্তমানে যা জানি তা শতশত মাইল দূরে শতশত বছর পর লিখিত হয়েছে। ইসলামে মুহাম্মদের গুরুত্ব প্রথম তুলে ধরেন খলিফা আব্দুল মালেক। এরও আগে মুহাম্মদের মৃত্যুর ৩০ বছর পর খলিফা মুয়াবিয়া জেরুজালেম গিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া যদি মুসলিম হয়ে থাকেন তবে তিনি ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সৃষ্টি করবেন। কিন্তু তার ইনস্ক্রিপশন, মুদ্রা, দলিলের কোথাও তিনি মুহাম্মদ বা ইসলামের কোন নিদর্শন রেখে যাননি। মুহাম্মদকে প্রথম অফিশিয়াল আরব ধর্মে যুক্ত করেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের। তিনি একজন দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। বিদ্রোহের কারণে আরবের গৃহযুদ্ধ তখন চরমে ওঠে। এর ফলে সদ্য সৃষ্টি হওয়া বিশাল আরব সাম্রাজ্য হুমকির মুখে পড়ে যায়। প্রত্যন্ত মরুভূমি থেকে উঠে এসে নতুন নতুন দাবীদারেরা বিশাল আরব সাম্রাজ্যের মসনদ দাবী করতে থাকে। ইবনে জুবায়ের তখন মুহাম্মদের গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তার গৃহীত সিদ্ধান্ত পুরো খেলাটিকেই বদলে দেয়, খুব সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসও। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর সম্রাট কনস্টান্টিনের মূল স্পন্দন ধরতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর বুকে শুধু মাত্র ভালো রাজা হয়ে কোন সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যায় না।

---

[43] Abu Dawud 1348:388

সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে হয় তাকে অত্যাচারিত হতে হবে নয়ত, ঈশ্বরের আনুকূল্য পেতে হবে। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর কনস্টান্টিন রোমান সাম্রাজ্যের জন্য চার্চের বৈধতা আদায় করেছিলেন। যার ফলে রোম সাম্রাজ্য একক ঈশ্বরের আনুকূল্য লাভ করে দীর্ঘকালীন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতি টেনে সম্প্রসারণশীল খ্রিষ্ট ধর্মের সঙ্গে আঁতাত করে। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরও একই কাজের চেষ্টা করেন। তিনি সাবেক শাসক মুহাম্মদকে কাজে লাগান। তিনি আবিষ্কার করেন মুহাম্মদের নাম তাকে সাম্রাজ্যের অপরিসীম ক্ষমতা দিতে পারবে যদি তিনি তাকে ঐশ্বরিকতা দান করেন। মুহাম্মদকে ব্যবহার করে তিনি সমগ্র আরব সাম্রাজ্যকে একটি পতাকার নিচে নিয়ে আনার মত ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি সফল হননি, প্রতিপক্ষ সেনাপতির কাছে পরাজিত হন। বিজয়ী সেনাপতি আব্দুল মালেক মসনদে বসেন। আরব সাম্রাজ্য ভয়াবহ প্রতিপক্ষদের হাতে তুলে দেয়ার কোন ইচ্ছাই আব্দুল মালেকের ছিল না। তাই তাকেও আসতে হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রচিত ধর্মের ছায়াতলে। তিনি এই সুযোগটির সর্ব উৎকৃষ্ট ব্যবহার করেছেন। ইসলামকে গড়ে তোলার মাধ্যমে আসলে তিনি নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করেন। রোমানরা ধর্ম ও ক্ষমতার সব ধরণের রহস্য এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতো। রোমানরা খ্রিষ্টান হওয়ার পর খ্রিষ্ট ধর্মকে নতুন করে গড়ে তোলে। আব্দুল মালেক ছিলেন মুসলিমদের রোমান।

***

# কোরান সংকলনের ইতিহাস

ইসলাম থেকে যদি মুহাম্মদকে বাদ দেয়া যায় তাহলে মুসলিমদের হাতে থাকে শুধু কোরান। কোরান হল ইসলামের মূল ভিত্তি। এটিকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত আলোচনা ও সমালোচনা। মুসলিমদের দাবী এই পুস্তকটি পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই ছিল। এটি কোন মানুষ লেখেনি বরং তা সরাসরি চতুর্থ আসমান বা লাওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীতে এসেছে মানব জাতির জন্য।[44] কোরান আল্লাহর সরাসরি বাণী। কোরানকে নিয়ে কোন প্রকার সমালোচনা করা যাবে না। কোরান কখনো পরিবর্তিত হয় নি। ২২ বছর ধরে বইটি মুহাম্মদের উপরে নাযিল হয়েছে। প্রতিটি মুসলিমের কাছে এই কথাগুলো ধ্রুব সত্য। হোক সে মুসলিম র‍্যাডিক্যাল, নমিনাল কিংবা লিবারেল; সবার কাছে এই গ্রন্থটি মহা পবিত্র আল কোরান। এটি মুহাম্মদের একমাত্র মোজেজা। সমস্ত পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুগুলোর মাঝে এটিই সেরা। কোরান পুরো মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশক।[45] কোরানের রচনা শৈলীর সঙ্গে পৃথিবীর কোন বইয়ের রচনাশৈলীর তুলনা হয় না। কোরান যেমন রচনাশৈলীর দিক থেকে সেরা তেমন এটি 'আলিয়্যুউল হাকিম' বা জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ। যেহেতু এটি মানব রচিত কোন গ্রন্থ না, তাই নাজিলের শুরু থেকে কোরানের বর্ণ, শব্দ, বাক্য এমনকি একটি বিন্দু পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি। নাজিলের সময় ঠিক যেমনই ছিল তেমনই আছে। ইসলামের মূলনীতিতে কোরানকে বলা হয়েছে, *No other book in the world can match*

---

[44] Sura 85:22
[45] Mishkat III, pg. 664

*the Qur'an ... The astonishing fact about this book of ALLAH is that it has remained unchanged, even to a dot, over the last fourteen hundred years. ... No variation of text can be found in it. You can check this for yourself by listening to the recitation of Muslims from different parts of the world.*[46]

উপরের ইংরেজি অংশটি আবার পড়ুন, খুব ভালো করে মস্তিষ্কে গেঁথে নিন। কেননা, পরের পৃষ্ঠাগুলোতে গিয়ে আমরা ইসলামের মূলনীতির এই বেদপ্রতীম বাক্যগুলোকে প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করব। যাই হোক, কোরানের প্রতিটি বাক্য মুহাম্মদ বলে দিতেন এবং তার সাহাবীরা তা লিখে রাখতেন। মুহাম্মদ নিজে লিখতে ও পড়তে জানতেন না; তিনি ছিলেন উম্মি বা মূর্খ। হাদিস কিন্তু বলে না তিনি মূর্খ ছিলেন। হাদিস থেকে বারংবার আমরা প্রমাণ পাই, তিনি লিখতে এবং পড়তে জানতেন। মুসলিমদের দাবী যেহেতু মুহাম্মদ উম্মি ছিলেন সেহেতু কোরানের মতো জ্ঞানগর্ভ বই শুধু মাত্র আল্লাহর পক্ষেই রচনা করা সম্ভব। ইসলামী ট্র্যাডিশন অনুযায়ী মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৮ বছর পর কোরান লিখিত হয়। মুহাম্মদের সাহাবীগণ কোরান লেখার কাজ সম্পন্ন করেন। এরপর কোরান তৎকালীন সমস্ত মুসলিম বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়ে।

কোরান দাবী করে বর্তমান কোরানের সূত্র ধরে উসমানের সংকলিত কোরানের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উৎসের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। উসমানের আমলের কোরান থেকে শুরু করে মুসলিমদের কাছে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত কোরান উসমানেরই সংকলিত যা জুবায়ের, আন আস, হারিছ, সাবিত কর্তৃক লিখিত। কিন্তু সহীহ বোখারির হাদিস থেকে আমরা মুসলিমদের এই দাবীর বিপরীত কিছু তথ্য পাই। কোরানের একাধিক পাঠ মুহাম্মদের জীবদ্দশাতেই ছিল। মুহাম্মদের সময়ে, ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুটো পাঠের মাঝে কোরানের কোনটি সঠিক?' নবী উত্তর দিলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদেরটি।' এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ তার কাছে

---

[46] Basic Principles of Islam, p. 4

আসলেন, এবং তিনি শিখলেন কোরানের কোন আয়াতটি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কোন আয়াতটি রোহিত করা হয়েছে।

মুসলিমদের মতে, মুহাম্মদ তার মৃত্যুর সময় ও ক্ষণ সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস পাননি। তাই তার সময়কালে ওহী সংকলনও করেননি। মুহাম্মদ যদি নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস না পান তবে কিভাবে তিনি বিদায় হজ্বে গিয়ে বিদায়ী ভাষণ দিলেন? এ ধরণের বিপরীতার্থক ঘটনা একই সাথে সঠিক হতে পারে না। হয় বিদায় হজের ভাষণ বানোয়াট নইলে, মুহাম্মদ নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস জানতেন যা হাস্যকর একটি দাবী। আমরা যা বলতে চাইছি তা হলো, মুসলিমদের কাছে সব ধরণের সুযোগ ছিল মুহাম্মদের জীবদ্দশায় কোরান লিপিবদ্ধ করার। কিন্তু তারা সেটা করেনি। বরং উসমানের সিদ্ধান্ত নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।

তাফসীর ইবনে তাবারি থেকে বর্ণিত, হিশাম ইবনে হাকিমের মুখে কোরানের পাঠ শুনে দেখেন তাকে শেখানো নবীর সুরার সঙ্গে এটির কোন মিল নেই। এমনকি আয়াতের সংখ্যাও গড়মিল হয়ে যাচ্ছিল। এই বিষয় নিয়ে নবীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে নবী মন্তব্য করলেন যে, যেভাবে জানো সেভাবেই পাঠ কর...।[47] এমনই ভাবে উবাই ইবনে কাবের এরকম ভিন্ন পাঠ শুনে সন্দেহ হয় মুহাম্মদের নবীত্ব নিয়ে।[48] প্রাচীন অর্থোডক্স মুসলিমদের অনেকের ধারণা ছিল, কোরান কোন অপরিবর্তিত গ্রন্থ নয়। এমনকি, খোদ নবীই বলেছেন, সাবিত যেন ইহুদীদের কিতাব নিয়ে পড়াশোনা করে। কেননা নবীর সন্দেহ ওরা কোরান পরিবর্তন করে ফেলতে পারে।[49]

কোরান প্রথম সংগ্রহ শুরু করা হয় খলিফা আবু বকর কর্তৃক। ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফেজ শহীদ হওয়ার কারণে তিনি শঙ্কিত বোধ করেন। আবু বকর এরপর যাইদ ইবনে সাবিতকে ডেকে কোরান সংকলনের জন্য অনুরোধ করেন। সাবিত আবু বকরের কথা মত কাজ করেন; কিন্তু ব্যাপারটা তার জন্য সহজ ছিল না। তিনি বলেছেন, কোরানের এত পরিমাণ ফ্রাগমেন্ট পুরো আরবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যে তা

---

[47] Tabari: 4
[48] Tabari: 23
[49] Tabari VII:167

সংগ্রহের চাইতে পাহাড় সরানো অনেক সহজ কাজ। চৈনিক রূপকথার হিউয়েন সাঙের মতো দশ হাজার মাইলের পথ পাড়ি দিয়ে বুদ্ধের বাণী সংগ্রহের যে গল্প গাঁথা প্রচলিত রয়েছে; সাবিতের কোরান সংগ্রহের রূপকথা এর থেকে কোন অংশে কম না।

সাবিতের সংগ্রহীত কোরান আবু বকরের মৃত্যুর পর খলিফা উমরকে দেয়া হয়। মৃত্যু পর্যন্ত উমর তা নিজের কাছে রেখেছিলেন। উমরের মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপিটি তার কন্যা হাফসা পান। উসমান খলিফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটিই ছিল সমগ্র আরবের একমাত্র সরকারী পাণ্ডুলিপি। কাজেই বলা যায়, ২০ হিজরিতে মুহাম্মদের হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে কোরান নাযিল হওয়ার সময় থেকে উসমানের সংকলন পর্যন্ত কোরান শুধু মৌখিকভাবে প্রচলিত একটি গ্রন্থ ছিল। অথচ মুসলিমদের দাবী এতটা দীর্ঘ সময় মুখস্থ প্রথায় থাকার পরও কোরানের কোন অংশ বিকৃত হয়ে যায় নি, কোরানের লিখিত কোন অংশ হারিয়ে যায় নি, বা কোন গবাদি পশু খেয়ে ফেলে নি। ১২ হিজরিতে আবু বকরের অনুরোধে সাবিত যে কোরানটি সংকলন করেছিলেন তাত্ত্বিকভাবে শুধু মাত্র সেটিকেই মূল কোরান হিশেবে ধরে নেয়া যায়, যদিও সেটিও সম্পূর্ণ কোরান ছিল না। মুসলিমদের হাতে সেই কোরানটি নেই, এ সম্পর্কে সাবিত বলেন 'যা তোমাদের হাতে আছে' (بَيْنَ يَدَيْكُمْ) অর্থাৎ যেটা হাতে আছে তা সাবিতের কোরান নয়।

বুখারি শরীফের ৫০৯ নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কোরানের বড় একটি অংশ হারিয়ে গেছে। কিছু আয়াত হাফেজগণ ভুলে গেছেন।[50] [51] এছাড়াও আরও অনেক হাদিস থেকে পাওয়া যায় যেখানে পাথর মারার আয়াত, রজমের আয়াত, বুকের দুধ খাওয়ানোর আয়াত, বংশগতি বিদ্যার আয়াত কোরানে যুক্ত করা হয়নি। এসব বিতর্কের দায় নিয়ে উসমানের আদেশে কোরান আবার নতুন ভাবে সংকলন করা হয়। তখন সাবিত ছাড়াও অন্য সাহাবীদের কাছে আরও অনেক কোরানের পাণ্ডুলিপি

[50] Bukhari:V6B61N550
[51] Bukhari:V6B61N559

ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ ছিলেন তাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মুহাম্মদ নিজে তার কোরান পাঠকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তার কাছে যে কোরানটি ছিল তা অন্যদের তুলনায় বেশ আলাদা। তার লিখিত ২ টি সুরা উসমানের সংকলিত কোরানে জায়গা পায়নি। সুরা দুটির নাম সুরা কাউল ও সুরা হাফিজ। এর সাথে ১০ নং সুরার ২৪ নং আয়াতে মানুষের লোভের বিষয়ে যা বলা আছে তা আগের লিখিত কোরানে ছিল না।[52]

এছাড়া সিরিয়ায় ব্যবহৃত উবাইয়ের আয়াতসমূহ, আলীর আয়াতসমূহ (তিনি নাজিলের ক্রম অনুসারে সুরা সাজিয়েছেলন), তিনি সুরা আলাক ৯৬ নং সুরা প্রথমে রাখেন। ইবনে আব্বাসের হস্ত লিখিত কোরানের কথা আল-সুখুতি উল্লেখ করেছেন, মানুষের লোভের বিষয়ে আয়াতটিও তার কোরানে ছিল। হাদিস থেকে এমন অসংখ্য রেফারেন্স দেয়া সম্ভব যা উসমানের কোরানে সংকলিত হয়নি।

উসমানের সংকলিত কোরান এবং অন্যদের মুখস্থ কোরানের মাঝে এত বেশি পার্থক্য ছিল যে, ইরাকের মসূল থেকে আগত লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইবনে মাসুদের কোরান ও সিরিয়ার উবাইয়ের কোরানকে অনুসরণ করা শুরু করে এবং একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে।

এই খবর শুনে উসমান হাফসার কাছে গিয়ে তার কোরানটি নিয়ে সাবিতকে দেন, এবং সাবিত আন আস, হারিস ও হিশামকে সঙ্গে নিয়ে কোরানকে কুরাইশদের কথ্য ভাষায় সংকলন করেন। এটি অবাক করার মত একটি ব্যাপার যে তখনকার আরবে স্ট্যান্ডার্ড কোন আহরূফ বা ভাষা রীতি ছিল না। অনুলিপি তৈরির পর হাফসার কোরান ফিরিয়ে দেন এবং প্রতিটি মুসলিম প্রদেশে একটি করে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। উসমান কর্তৃক সংকলিত কোরানের মূল পাণ্ডুলিপিগুলো রেখে বাকী সমস্ত অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, ফ্রাগমেন্ট, হাড়ের উপরে, চামড়া বা পার্চমেন্টের উপরে লেখা কোরানের অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। উসমানের লোকজন পাণ্ডুলিপি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসলিমদের উপরে জোর জবরদস্তি, নিপীড়ন শুরু করে দেয়। পৃথিবীর

[52] Muslim:V1N258&286

ইতিহাসে স্বজাতিদের দ্বারা পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা শুধু মুসলিমদের মাঝেই ঘটেছে। কিন্তু কেন পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর মহাযজ্ঞ হয়েছিল? কী এমন দরকার পড়েছিল যে কোরানের সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে হবে? এর সম্ভাব্য উত্তর হল উসমানের পাণ্ডুলিপির সাথে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির অমিল ছিল। বিরোধী বা সাংঘর্ষিক বক্তব্যের কারণে পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই পাণ্ডুলিপিগুলো যদি অদ্যবদি থাকতো তবে ইসলামের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সম্ভব হতো। ইসলামের হাজার বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কোরানের যে রদবদল করা হয়েছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো উসমানের কোরান পোড়ানোর ঘটনা। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, উক্ত ঘটনার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কোথাও কোন প্রমাণ নেই যে উসমান আদৌ কোরান সংকলন করেছিলেন কিনা এবং চারটি প্রধান শহরে তা পাঠিয়েছিলেন কিনা। ইসলামি ট্র্যাডিশন অনুযায়ী চারটি পাণ্ডুলিপি মদিনা, বসরা, বাগদাদ ও দামেস্কয় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

Sahih al-Bukhari Vol. VI (509)

509. Narrated Zaid bin Thābit: Abū Bakr As-Siddīq sent for me when the people of Yamā-ma had been killed (i.e., a number of the Prophet's Companions who fought against Musailama). (I went to him) and found 'Umar bin Al-Khattāb sitting with him. Abū Bakr then said (to me), "'Umar has come to me and said: "Casualties were heavy among the Qurrā' of the Qur'ān (i.e. those who knew the Qur'ān by heart) on the day of the Battle of Yamāma, and I am afraid that more heavy casualties may take place among the Qurrā' on other battlefields, whereby a large part of the Qur'ān may be lost. Therefore I suggest, you (Abū Bakr) order that the Qur 'ān be collected." I said to 'Umar, "How can you do something which Allāh's Apostle did not do?" 'Umar said, "By Allāh, that is a good project." 'Umar kept on urging me to accept his proposal till Allāh opened my chest for it and I began to realise the good in the idea which 'Umar had realised." Then Abū Bakr said (to me). 'You are a wise young man and we do not have any suspicion about you, and you used to write the Divine Inspiration for Allāh's Apostle. So you should search for (the fragmentary scripts of) the Qur'ān and collect it (in one book)." By Allāh! If they had ordered me to shift one of the mountains, it would not have been heavier for me than this ordering me to collect the Qur'ān. Then I said to Abū Bakr, "How will you do something which Allāh's Apostle did not do?" Abū Bakr replied, "By Allāh, it is a good project." Abū Bakr kept on urging me to accept his idea until Allāh opened my chest for what He had opened the chests of Abū Bakr and 'Umar. So I started looking for the Qur'ān and collecting it from (what was written on) palm-leaf stalks, thin white stones and also from the men who knew it by heart, till I found the last Verse of Sūrat At-Tauba (Repentance) with Abī Khuzaima Al-Ansārī, and I did not find it with anybody other than him. The Verse is:

> Verily there has come unto you an Apostle (Muhammad) from amongst yourselves. It grieves him that you should receive any injury or difficulty......(till the end of "Sūrat-Barā'a (At-Tauba) (9:128-129)

Then the complete manuscripts (copy) of the Qur'ān remained with Abū Bakr till he died, then with 'Umar till the end of his life, and then with Hafsa, the daughter of 'Umar.

বৃহৎ চিত্রটি অপর পৃষ্ঠায়

509. Narrated Zaid bin Thābit: Abū Bakr As-Ṣiddīq sent for me when the people of Yamā-ma had been killed (i.e., a number of the Prophet's Companions who fought against Musailama). (I went to him) and found 'Umar bin Al-Khaṭṭāb sitting with him. Abū Bakr then said (to me), "'Umar has come to me and said: "Casualties were heavy among the Qurrā' of the Qur'ān (i.e. those who knew the Qur'ān by heart) on the day of the Battle of Yamāma, and I am afraid that more heavy casualties may take place among the Qurrā' on other battlefields, whereby a large part of the Qur'ān may be lost. Therefore I suggest, you (Abū Bakr) order that the Qur 'ān be collected." I said to 'Umar, "How can you do something which Allāh's Apostle did not do?" 'Umar said, "By Allāh, that is a good project." "Umar kept on urging me to accept his proposal till Allāh opened my chest for it and I began to realise the good in the idea which 'Umar had realised." Then Abū Bakr said (to me). 'You are a wise young man and we do not have any suspicion about you, and you used to write the Divine Inspiration for Allāh's Apostle. So you should search for (the fragmentary scripts of) the Qur'ān and collect it (in one book)." By Allāh! If they had ordered me to shift one of the mountains, it would not have been heavier for me than this ordering me to collect the Qur'ān. Then I said to Abū Bakr, "How will you do something which Allāh's Apostle did not do?" Abū Bakr replied, "By Allāh, it is a good project." Abū Bakr kept on urging me to accept his idea until Allāh opened my chest for what He had opened the chests of Abū Bakr and 'Umar. So I started looking for the Qur'ān and collecting it from (what was written on) palm-leaf stalks, thin white stones and also from the men who knew it by heart, till I found the last Verse of Sūrat At-Tauba (Repentance) with Abī Khuzaima Al-Anṣārī, and I did not find it with anybody other than him. The Verse is:

> Verily there has come unto you an Apostle (Muḥammad) from amongst yourselves. It grieves him that you should receive any injury or difficulty......(till the end of "Sūrat-Barā'a (At-Tauba) (9:128-129)

Then the complete manuscripts (copy) of the Qur'ān remained with Abū Bakr till he died, then with 'Umar till the end of his life, and then with Hafṣa, the daughter of 'Umar.

٥٠٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم ابن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن عبيد بن السباق: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم - حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.

সহিহ বোখারি: ষষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং: ৫০৯

এখানে লক্ষণীয়, হাফসার কোরান অর্থাৎ কোরানের প্রথম পাণ্ডুলিপি যা আবু বকরের শাসনামলে সংকলিত হয়েছিল তা উসমান কর্তৃক হাফসাকে ফেরত দেয়া হয় এবং প্রতিটি এলাকায় ঐ চারটি কোরান পাঠিয়ে দেয়ার পর পুরো মুসলিম বিশ্বে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কোরান ছিল না। মদিনার গভর্নর মারওয়ান হাফসার পাণ্ডুলিপিটি পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু হাফসা সেটি আমৃত্যু আগলে রাখেন। ইবনে আবু দাউদ কর্তৃক লিখিত আল মাসাহিকে আমরা দেখি, হাফসার মৃত্যুর পর মারওয়ান লোক পাঠিয়ে পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন। তারা কোরানের কিছু পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে। আব্দুল্লাহ ইসনাদ নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন, এর মাঝে এমন কিছু লেখা ছিল যা অন্য পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয়নি।[53] ইবনে মাসুদের কোরানও তার নিজের কাছে ছিল, এবং মৃত্যুর পর সেটি ধ্বংস করে ফেলা হয়।
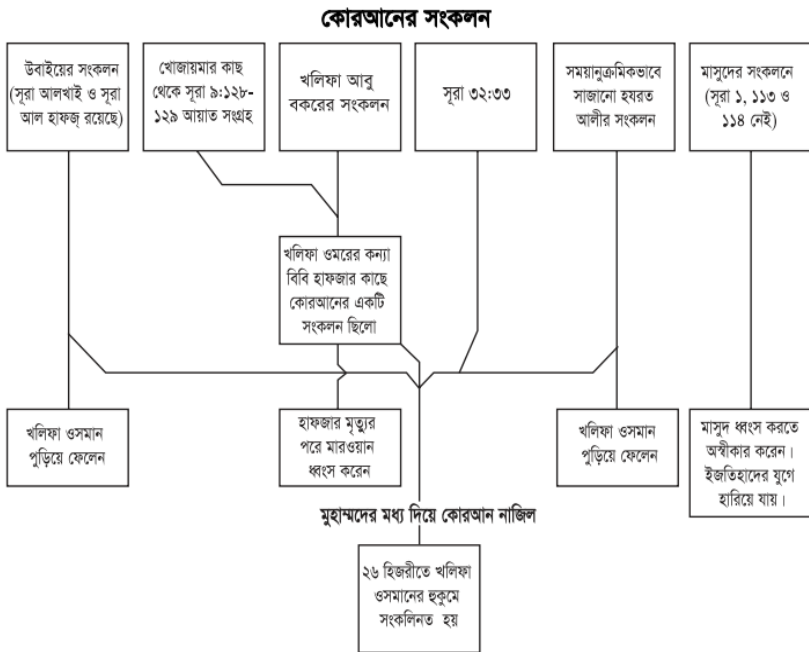
চিত্র: কোরান সংকলনের তালিকা

[53] Al-Masahif by Ibn Abu Dawud:24-25

হিজরতের প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারার সময়কালকে ইজতিহাদ (ইখতিয়ার- Free will) বলা হয়। কোরানের অনেক শিক্ষকরা তখন নবীর বিভিন্ন সাহাবীদের তেলাওয়াত অনুযায়ী কোরান শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বিষয়টি গোঁড়া মুসলিমদের কাছে এতটাই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে সানাবুধ (২৪৫-৩২৮) যিনি পুরনো পাণ্ডুলিপি থেকে তেলাওয়াত করতেন বলে তাকে অস্বীকার করতে বলা হয়। এভাবে ইসলামের জন্মের পরের ৩০০ বছরে জোর জবরদস্তির ফলে কোরানের বিভিন্ন ধরণের পাঠ হারিয়ে যায়। হজরত উসমানও কোরান সংকলনের পর অন্যান্য সাহাবিদের কোরান ধ্বংস করতে এত মরিয়া ছিলেন যে তিনি সব ধরণের কূট কৌশল ব্যবহার করেন। কোথাও কোথাও জোর জবরদস্তি মূলকভাবে তার লোকেরা কোরানের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করত।[54]

কোরানের বিভিন্ন পাঠের বিষয়ে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ উদাহরণ হিশেবে দেয়া যেতে পারে। কোরানের সর্ব শেষ নাজিল কৃত সুরা আহজাব নিয়ে মওলানা ইউসুফ আলী বর্ণনা করেছেন, উসমানের কোরানের ৩:৩৬ আয়াতে লেখা আছে, ‘নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ এবং তার পত্নীরা।’ কিন্তু কাবের কোরানে এই আয়াতটি লেখা ছিল, ‘নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের থেকে বেশি ঘনিষ্ঠ এবং তিনি তাদের পিতা আর তার পত্নীরা তাদের মাতা।’[55] কোরানের বিভিন্ন ধরণের পাঠ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনূদিত ফারসি কোরানে রয়েছে।[56]

এটি হলো মুসলিমদের বর্ণিত কোরান সংকলনের সার্বজনীন ইতিহাস। এই ঘটনার কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু এটিকেই জনপ্রিয় ইতিহাস হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তৎকালীন সময়ে লিখিত কোন দলিল কেউ দেখাতে পারবে না। মূল কোরানের সঙ্গে বর্তমানের কোরানের আদৌ কোন অমিল আছে কিনা এটা জানা সম্ভব না। কেননা উসমান কোরানকে নিজের মত করে রিফরমেশন করে বাকী কোরানগুলো পুড়িয়ে

---

[54] Kitab al Masahif by Ali Ibne Dawud, Hadith no. 407
[55] Yusuf Ali: Footnote-3674; p.1104
[56] Hamidullah: Footnote-3678, p. xxxiii

ফেলেছিলেন। ফলে মুসলিমদের বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয় যে উসমানের কোরানই ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম কোরান, এ ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় নেই। এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমরা তর্ক করবে, অন্ধের মতো যুক্তি দেবে, লড়াই করবে, এমনকি মানুষ হত্যাও করতে পিছপা হবে না।

উসমানের চারটি মূল পাণ্ডুলিপি মদিনা, বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক পাঠানোর পর সেখান থেকেই বর্তমানের কোরান বিকাশ লাভ করে যার কোন আয়াত, শব্দ, অক্ষর, এমনকি একটি চিহ্নও পরিবর্তিত হয়নি।[57] এখন প্রশ্ন হল, কোথায় আছে সেই পাণ্ডুলিপিগুলো? শুধু মাত্র মুসলিমদের দাবীই সত্যতা বিচারের জন্য যথেষ্ট না। কোন পশ্চিমা বিশেষজ্ঞই এটা মানবেন না। কোরান নিয়ে সমালোচনা, ইসলাম নিয়ে সমালোচনা গ্রহণের রীতি মুসলিমদের মাঝে নেই, তাই কোরানের সঠিক বিকাশের উপরে প্রাচীন কোন নথির হদিশ পাওয়া সম্ভব না। মুসলিমদের কাছে অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কোন প্রমাণ নেই যে কোরান অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ, মুসলিমদের একমাত্র প্রমাণ হলো তাদের অন্ধ বিশ্বাস।

ড. ওয়েন্সবার্গ, শেট, রিপিন, ক্রোন, এবং হামফ্রেসের মতে, স্কলারদের স্বাধীনভাবে কোরান-হাদিস নিয়ে গবেষণার ফলে জানা গেছে কোরান একক কোন মানুষের দ্বারা রচিত হয়নি; বরং ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে একদল মানুষের দ্বারা লিখিত, সংশোধিত, সম্পাদিত, ও সংকলিত হয়েছে। আমরা আজ যে কোরান পড়ি সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের কোরানের সঙ্গে এর মিল খুব কম। বর্তমানের কোরান অষ্টম ও নবম শতাব্দীর সৃষ্টি। কোরান নাজিলের স্থান মক্কা, মদিনা, বা বাগদাদ না। বরং কোরান বিকশিত হয়েছে অন্য কোথাও। মুহাম্মদের জীবদ্দশায় ইসলামের কোন সম্পর্ক ছিল না। তার মৃত্যুর পর ইসলাম গড়ে উঠেছে আরবদের হাত ধরে।

মজার ব্যাপার হলো ইসলাম থেকে হাদিসকে যদি আলাদা করে ফেলা যায় তাহলে ইসলামের ধরণ, গড়ন, আকার সবকিছু গিয়ে ঠেকে কোরানের উপর। স্কলাররা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন, ঐ সময়ের ইসলাম সম্পর্কিত উৎসগুলোর প্রাপ্ত তথ্য খুবই

---

[57] Towards Understanding Islam by Maududi

বিরল। ইসলামের প্রথম লিখিত নথি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইবনে ইসহাকের ‘সিরাত রাসুলাল্লাহ’ হারিয়ে গেছে নাকি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইসলামের যেকোনো তথ্যের জন্য সেক্যুলার স্কলারদের নির্ভর করতে হয়েছে ৫০-১০০ বছর পরের সিরাতের উপরে। এখন পর্যন্ত যতগুলো বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য বিবেচনা করা হয়েছে তার একটিও কোরান, হাদিস বা মুহাম্মদের পক্ষে যায়নি। কোরান নিয়ে যারাই গবেষণা করেছে তারাই স্বীকার করেছে, এই দৈব বাণীর উদ্ভব ঘটে আব্বাসীয় শাসনামলে, এবং মহাত্ম পায় অষ্টম শতকের শেষ ভাগে। ওয়েন্সবার্গের মতে, কোরান সংকলিত হয়েছে হাদিসেরও পরে। আমরা দেখি হাদিসের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে কোরান জড়িয়ে আছে। মৌখিক প্রথায় ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন হাদিস বর্ণনা শেষে তা বিশ্বাসযোগ্য করতে কিংবা হাদিসকে সত্য হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কোরানের বিভিন্ন আয়াত প্রামাণিক উক্তি হিশেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। পরবর্তীতে এই আয়াতগুলোকে সংকলিত করে একক কোরানের রূপ দেয়া হয়েছে। ওয়েন্সবার্গের এই ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ যৌক্তিক। এর মাধ্যমে কোরানের সঙ্গে মুহাম্মদের সম্পর্কের একটি স্বচ্ছ কারণ দাঁড় করানো যায়।

নবম শতাব্দীর ইসলাম বিকশিত হয়েছে বাগদাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ও আইনত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে একজন অশিক্ষিত মানুষের বাসস্থানকে কেন্দ্র করে যা প্রাচীনকালে সমস্ত পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ও অজানা ছিল। কেননা সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিচয় তৈরির জন্য এটা একদম সহজ কাজ; এবং মুহাম্মদ আরবের বিরান মরুভূমিতে খাপ খেয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত একটি চরিত্র ছিলেন। মোহাম্মদের কোরান নিঃসন্দেহে দুর্বল, ভ্রান্ত, জড়, বিকৃত, চুরি কৃত, এবং হযবরল ছিল। কোরান এতটাই চোরাই জিনিস ছিল যে মুহাম্মদ সেটি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নাগালের বাইরে গোপন রাখতে বলেছিলেন।[58] কোরান নিয়ে বিশৃঙ্খলা এত বেশি ছিল যে মুহাম্মদকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার মত যথেষ্ট জায়গা

[58] Muslim: C24B20N4609

ছিল। মধ্য আরব সে সময়ে এতটা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছিল যে বিশ্ব সভ্যতার অংশ তো দূরের কথা কোথাও তা পরিচিতও ছিল না। এ কথা স্বয়ং আরবরাই স্বীকার করে বলে, তখন আরবের সভ্য ও সমৃদ্ধ কোন সংস্কৃতি ছিল না তাই সেই সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়াত বলা হয়।

কাকতালীয় ভাবে বর্তমান সময়ের বিশেষজ্ঞরা ইসলামের ব্যাপারে একমত হতে পেরেছেন। জে স্মিথ বর্ণনা করেছেন, কোরানের স্বচ্ছ সমালোচনার জন্য শুরুর দিকে যাওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন উৎসগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। কোরানের সঠিক সত্যতা প্রমাণের জন্য এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রগুলোকে বের করে আনতে হবে। যেহেতু ইসলামের প্রথম শতাব্দী সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে কিছুই পাওয়া সম্ভব না; তাই আমাদের প্রাথমিক উৎসের জন্য দীর্ঘ ১৫০-৩০০ বছর পেছনে দেখতে হবে। এবং এই বিষয় নিয়ে ড. ক্রোন, ওয়েন্সবার্গ, রিপিনের মতো গবেষকদের গবেষণা সঠিক।

***

# কোরানের পাণ্ডুলিপি

মুসলিমদের দাবী উসমানের চারটি পাণ্ডুলিপির মাঝে এখনও দুটো পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যটা হল আদি কোরানের কোন প্রকার নমুনা মুসলিমদের কাছে নেই। মূল চারটি কোরানের পাণ্ডুলিপির একটিরও ছিন্ন ভগ্নাংশ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। পাণ্ডুলিপিগুলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ নাগাদ উত্তর আফ্রিকা থেকে স্পেন পর্যন্ত, লাভান্ত (Levant) থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ইসলামের ছায়াতলে চলে যায়। এই বিশাল সাম্রাজ্যটিকে যে জিনিষটি এক সুতোয় গেঁথে রেখেছিল সেটা হচ্ছে আল কোরান। মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসের একমাত্র শৌখিন বস্তু ছিল কোরান। এত বিপুল পরিমাণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকার পরও সপ্তম শতকের কোরানের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। কোরানের যে পাণ্ডুলিপিগুলো মুসলিমদের হাতে আছে তা ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের কারও দ্বারা লিখিত না। যেখানে খ্রিষ্টানরা যীশুর মৃত্যুর ২৫-৩৫০ বছরের মাঝে লেখা নিউ টেস্টামেন্টের গ্রীক ভাষার ৫,০০০ ফ্রাগমেন্ট, পাণ্ডুলিপির ১,০০০ ল্যাটিন ভলগেট, ৯,৫০০ অন্যান্য প্রাচীন টেক্সট সহ মোটমাট ২৫,০০০ নিউ টেস্টামেন্টের ফ্রাগমেন্ট দাবী করে সেখানে মুসলিমরা অষ্টম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত কোরানের একটা ফ্রাগমেন্টও দেখাতে পারে না। বাইবেলের পার্চমেন্ট লেখার সময়কালে কাগজের প্রচলন খুব একটা ছিল না, তাই সেগুলো পার্চমেন্টে লেখা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সভ্যতা বিকাশের সময় কাগজ বহুল প্রচলিত একটি বস্তু ছিল। মুসলিমরা কাগজ

ব্যবহার না করে গাছের বাঁকল, পাতা, পশুর হাড়ে ও চামড়ার উপরে কোরান লেখত কেন?

প্রমাণের অভাবের কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কোরান বা হাদিসের কোন টুকরো না থাকার অর্থ হচ্ছে ১০০ বছর পূর্বে ওগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং আরবের বিচ্ছিন্ন কিছু লোকগাথা, কবিতা, পুঁথি সাহিত্য, ও মুহাম্মদকে সংযুক্ত করে কোরান ও হাদিসের জন্ম দেয়া হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা বর্ণনা করেছি মুহাম্মদের ঐতিহাসিক সত্যতা, ও মক্কার গুরুত্বের প্রমাণ নিয়ে। এই অংশগুলোতে আলোচনা করব শুধু মাত্র কোরান নিয়ে।

মানব ইতিহাসের প্রথম কয়েক হাজার বছর আরবের বেদুইনরা ছিল নির্ভেজাল, আক্ষরিক অর্থে স্ব নির্ভরশীল, শান্তিকামী, ও স্বাধীন একদল মানুষ। তারা এতটাই ভবঘুরে ও স্বাধীন ছিল যে বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও তাদের উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে আরবরা পৃথিবী গ্রহের ইতিহাসে সবচাইতে নিষ্ঠুর জাতি হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে। আরবরা সভ্য জগত জয় করে, লুট করতে থাকে তাদের সম্পদ, লুটের মালের উপরে কর আরোপ করে, ধর্ষণ, হত্যা, সন্ত্রাসী আক্রমণ সহ হেন কোন অপরাধ নেই যা আরবদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। আরব সাম্রাজ্যের বিশাল বদ্বীপ ভেসে আছে নিরপরাধ মানুষের রক্তের মহাসাগরে। কিছু একটা বদলে দিয়েছিল আরবদের। যদি মুহাম্মদ এবং কোরান এর জন্য দায়ী না হয় তবে দায়ী কারা এবং কী? আরবের মরুভূমিতে আসলে কী ঘটেছিল সেটা কোন ব্যাপার না। মুসলিমরা কিসে বিশ্বাস করে সেটাই মূল। সেকারণেই সমগ্র পৃথিবী আজ ভীত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে।

কোরানের মূল পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে স্মিথের বক্তব্য একেবারে টিপিক্যাল। তার ভাষ্য অনুযায়ী, 'মুসলিমদের দাবী সপ্তম শতাব্দীর কোরানের পাণ্ডুলিপিগুলো এখনও তাদের কাছে আছে। সেগুলো মক্কা, কায়রোয় তাদের প্রাচীন সেটেলমেন্টগুলো রাখা আছে। এটির অফিশিয়াল ঘোষণা নেই, শুধু মুখে মুখে প্রচলিত। সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য চাওয়া হলেও এর ইতিবাচক জবাব কখনো পাওয়া যায়নি।' দুটো পাণ্ডুলিপির

বিশ্বাস যোগ্যতা এখনও দাবী করা হয়। এর মাঝে একটি সমরখন্দ পাণ্ডুলিপি যা তাশখন্দ লাইব্রেরিতে রয়েছে অপরটি তোপকাপি পাণ্ডুলিপি যা তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলোর প্রাচীন হস্তলিপি বিশ্লেষণ, পাণ্ডুলিপিতে শব্দের বুৎপত্তি, পোলিওগ্রাফ বিশ্লেষণ করে যা জানা গেছে তা মুসলিমদের দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীতে যায়।

## সমরখন্দ ও তোপকাপি পাণ্ডুলিপি

সমরখন্দ কোরানের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না। এতে কোরানের মাত্র ৪৪% অংশ পাওয়া গেছে, এর এবং বাকী ৬৬% এর কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। সংখ্যার দিক থেকে ২-৪৩ পর্যন্ত সুরা এই পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। এর মাঝে অনেক সুরারও পাঠ বা টেক্সট মিসিং। এই পাণ্ডুলিপির মূল সমস্যা হল খুবই অস্বাভাবিক হাতের লেখা। কিছু পৃষ্ঠার লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন, আবার কিছু পৃষ্ঠার লেখা অপরিচ্ছন্ন এবং আঁকাবাঁকা। কিছু পৃষ্ঠার টেক্সট সুন্দরভাবে টানা ও লম্বা আবার কিছু পৃষ্ঠার লেখা ঘন ও একে অপরের সাথে জড়ানো। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কোন অদক্ষ লিপিকার দ্বারা এটি লিখিত হয়েছে। যে সময়ে আরবি অক্ষর ‘কাফ’ কোরানের পাঠ থেকে বাদ হয়েছে, তখন অন্যান্য বর্ণগুলো শুধু দীর্ঘায়ত না সেগুলো টেক্সটের মাঝে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অক্ষর হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ পাণ্ডুলিপির অনেকগুলো পৃষ্ঠা ব্যাপকভাবে একে অন্যের থেকে আলাদা। ধারণা হয় উক্ত পৃষ্ঠাগুলো অন্য পাণ্ডুলিপি থেকে জুড়ে দেয়া হয়েছে।[59] অবশ্য সুরাগুলোর মাঝে শৈল্পিক ধরণটা বেশ লক্ষণীয়। অক্ষরগুলোতে লাল, নীল, সবুজ, কমলা রঙের ব্যবহার রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নীল ও কমলা রঙের বৃত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। লেখার ধরণ ও রীতি দেখে হস্তলিপি বিশারদগণ বলেছেন এ ধরণের কোডেক্সগুলো নবম শতাব্দীতে ব্যবহার করা হতো।

[59] Gilchrist 1989:150

সপ্তম শতাব্দীতে উসমানী পাণ্ডুলিপিগুলো যে সমস্ত প্রদেশে পাঠানো হয়েছে তাতে এ ধরণের কোডেক্স ব্যবহার করা অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার।[60]

তোপকাপি পাণ্ডুলিপিটিও সমরখন্দ পাণ্ডুলিপির মতো একটি পার্চমেন্টে লেখা, এবং এই পাণ্ডুলিপিতে স্বরবর্ণের চিহ্ন বা নোক্তা যুক্ত করা রয়েছে।[61] এটিরও অক্ষরগুলো বিভিন্ন রঙে ও বিভিন্ন ধরণের বৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা সাজানো রয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির সাজসজ্জা প্রমাণ করে এটি সমরখন্দ পাণ্ডুলিপির অনেক পরে লিখিত।[62] মুসলিমদের দাবী এটি যাইদ বিন সাবিতের সংকলিত মূল পাণ্ডুলিপি। তোপকাপি ম্যানুস্ক্রিপ্টে রক্তের দাগ লেগে আছে। উসমান পাণ্ডুলিপিটি তেলাওয়াত করার সময় নিহত হন। দাবী করা হয় রক্তের দাগ উসমানের। কেউ যদি সমরখন্দ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তোপকাপি পাণ্ডুলিপির তুলনা করে তবে বুঝতে পারবে দুটোর একটিও উসমানী সময়কালের না। ইস্তাম্বুলের পাণ্ডুলিপিটির প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৮টি লাইন আছে তাসখন্দের সমরখন্দ পাণ্ডুলিপিতে প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে ৮টি থেকে ১২টি লাইন। ইস্তাম্বুলের পাণ্ডুলিপিটির লিখন নিয়মমাফিক ভাবে সাজানো, শব্দ ও লাইনের মাঝে কোন ভিন্নতা দেখা যায় না। অপরদিকে সমরখন্দ পাণ্ডুলিপি ঠিক এর বিপরীত। এটির অবস্থা এলোমেলো। কেউই মানতে চাইবে না যে দুটো পাণ্ডুলিপি একই সময়ে ও একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে লেখা।

চিত্র: তোপকাপি ম্যানুস্ক্রিপ্ট, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

[60] Lings & Safadi 1976:17-20; Gilchrist 1989:151
[61] Gilchrist 1989, pp.151-153
[62] Lings & Safadi 1976:17-20

চিত্র: সমরখন্দ ম্যানুস্ক্রিপ্ট, তাশখন্দ, উজবেকিস্তান।

বিশেষজ্ঞরা পাণ্ডুলিপি লিখনের সময় নিরূপণের জন্য তিন ধরণের পরীক্ষা করেন। প্রথমত পার্চমেন্টের বয়স নির্ণয় করে বের করেন পাণ্ডুলিপিটি কখন লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কার্বন-১৪ টেস্ট অনেক জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। কার্বন-১৪ টেস্টের ফলাফল ২০ বছর কম বেশি হতে পারে। কার্বন-১৪ টেস্টে পাণ্ডুলিপির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা টেস্ট করতে ১-২ গ্রাম ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহার পুরো পাণ্ডুলিপিটিকে নষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কার্বন টেস্টিং এর আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিকে AMS বা Accelerator Mass Spectometry বলে। এই পদ্ধতিতে মাত্র ০.৫-১.০ মিলিগ্রাম ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা পাণ্ডুলিপির কালি নিয়েও গবেষণা করে পাণ্ডুলিপি লিখনের সঠিক বয়স নির্ণয় করতে পারেন। পার্চমেন্টে লেখা পাণ্ডুলিপির কালি অনেক সময় মুছে যায়। তখন সেই পার্চমেন্টের উপরে আবার লেখা হয়, কিংবা সেটা থেকে অনুলিপি তৈরি করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি বিলম্বিত হওয়ার কারণে পাণ্ডুলিপির সময় বের করা খুব কঠিন একটি কাজ। এধরণের সমস্যার কারণে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা কোরানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিষদ গবেষণায় অনেক সময় পিছিয়ে যান। তাই ম্যানুস্ক্রিপ্টের বয়স নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞরা হাতের লেখা গবেষণা করেন। হাতের লেখার ধরণ ও গড়ন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। পেশাদার পাণ্ডুলিপি লেখেকর হাতের লেখার

মাধ্য দিয়েই এই পরিবর্তন প্রকাশ পায়। হাতের লেখার কৌশল দেখে তখন পাণ্ডুলিপির বয়স বের করা সহজ হয়। সময়ের সাথে সাথে লেখার ধরণের যে বিকাশ লাভ করে তা পেলিওগ্রাফাররা অন্যান্য তারিখবিহীন হাতের লেখার সঙ্গে তুলনা করে বয়স বের করেন।

পেলিওগ্রাফির এই টেস্ট সমরখন্দ ও তোপকাপি দুটো পাণ্ডুলিপির উপরেই করা হয়েছে। এই টেস্টের ফলে পাণ্ডুলিপিগুলোর বয়স সম্পর্কে যে তথ্যগুলো বেড়িয়ে এসেছে তা রীতিমত কৌতূহল উদ্দীপক। উক্ত পাণ্ডুলিপি দুটো উসমানীয় তো নয়ই বরং ওগুলো সপ্তম শতাব্দীতেও লিখিত হয় নি। বেশির ভাগ মুসলমানই বুঝেন না যে পাণ্ডুলিপি দুটোই কুফিক স্ক্রিপ্টে লিখিত। মার্টিন লিংস এবং ইয়াসিন হামিদ সাফাদির মতো আধুনিক কুরান বিশেষজ্ঞদের মতে, ওগুলো ৭৯০ খ্রিস্টাব্দের আগে লিখিত হওয়া সম্ভব না। কারণ কুফিক স্ক্রিপ্টের প্রচলনই ঘটে ৭৯০ এর পরে।[63]

কুফিক স্ক্রিপ্ট মূলত আক-খাত আক কুফি হিশেবে বেশি পরিচিত। এটির উৎপত্তি ইরাকের কুফা শহরে। বিষয়টি অপ্রীতিকর হলেও সত্য আরবি কোরানের অফিশিয়াল কোরান লিখিত হয়েছে আরব থেকে শত শত মাইল দূরের কুফা শহরে উৎপত্তি হয়েছে এমন লিখন পদ্ধতিতে। উক্ত পাণ্ডুলিপি দুটি লিখিত হওয়ার মাত্র কয়েক বছর আগে কুফা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হলো, কুফা বর্তমান ইরাকের একটি শহর হলেও ৬৩৭-৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরবরা দখলের পূর্বে কুফা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কুফা শহরটি তখন পারস্য সংস্কৃতি ও ভাষার দখলে ছিল। শুরুর দিকে পারস্যবাসীদের কাছে আরবি ছিল বিদেশী ভাষা। তাছাড়া ইসলামের প্রথম শতাব্দীর বেশিরভাগ সময়ে নয়া আরব সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো সিরিয়া থেকে। সিরিয়ার সিরিয় ভাষার মাধ্যমেই প্রাচীন আরামিক ভাষার উৎপত্তি যা পরবর্তীকালে আরবি ভাষায় বিকাশ লাভ করেছিল। বাগদাদ আর দামেস্ক যখন আরব সাম্রাজ্যের ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল সিরিয়া তখন পুরো আরব বিশ্ব শাসন করত। সম্পূর্ণ অন্য ভাষা ও ঐতিহ্যে লালিত পালিত

---

[63] Lings & Safadi 1976: 12-13,17

একটি জাতিকে হুট করে আরেকটি ভাষা চাপিয়ে দেয়া সম্ভব না। ফলে আরব দখলদারিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরবি ভাষা কুফায় বিকাশ লাভ করেছিল এটা ভাবার কোন কারণ নেই। একটি অঞ্চলের অফিশিয়াল ভাষা বহুলভাবে প্রচারিত হতে দীর্ঘ সময় পারি দিতে হয়। গবেষকদের কাছে এর সঠিক সময়টা অজানা নয়। কুফিক স্ক্রিপ্ট পরিপূর্ণতা লাভ করে অষ্টম শতাব্দীতে। অর্থাৎ মুহাম্মদের মৃত্যুর আরও ১৫০ বছর পর। এরও কিছুকাল পর কুফিক স্ক্রিপ্ট মুসলিম বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যখন কুফিক স্ক্রিপ্টের প্রচলন ছিল তখন আব্বাসীয়রা ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করত। পারস্যের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পারস্যে সম্পর্কিত অতীত থাকার কারণে তারা আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তর করে কুফা এবং বাগদাদ অঞ্চলে। সেকারণেই আব্বাসিয়রা হাতের লেখার উপরে নিজস্ব সাক্ষর রাখতে চেয়েছে। কেননা আব্বাসীরা নিজেরাই উমাইয়াদের অধীনে গোলামের মতো প্রায় ১০০ বছর শাসিত হয়েছে। উমাইয়াদের ঘাটি ছিল দামেস্ক। এর থেকে বোঝা যায় আরবি স্ক্রিপ্ট ভীষণভাবে অঞ্চলভিত্তিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অঞ্চল ভিত্তিক প্রভাবের ফল স্বরূপ আমরা এই দুটি ম্যানুস্ক্রিপ্টে কুফিক স্ক্রিপ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত কুফা, নাজাফ, কারবালা শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর।

তোপকাপি ও সমরখন্দ পাণ্ডুলিপি দুটি অষ্টম শতাব্দীর তা বিবেচনা করার আরও একটি বড় কারণ হল, এগুলো ল্যান্ডস্কেপ ফরমেটে লেখা। কুফিক স্ক্রিপ্টের লেখার ধরণ দীর্ঘ। দুটি পাণ্ডুলিপিরই পৃষ্ঠাগুলো লম্বের তুলনায় একটু বেশিই প্রস্থ। এই ফরমেটের লেখার ধরণ অষ্টম শতাব্দীর সিরিয়ান ও ইরাকি খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন নথি পত্রে ব্যবহার করা হতো। কুফিক স্ক্রিপ্ট সেখান থেকেই অনুকরণ করা হয়েছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে মুসলিম স্কলারদের বক্তব্য কী? তারা কি স্বীকার করে এই পাণ্ডুলিপিগুলো উসমানের শাসনামলে লিখিত? ২০০২ সাল পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিগুলো কেউ স্পর্শ করতে পারত না। কিন্তু ২০০২ সালের পর পাণ্ডুলিপিগুলো বেছে বেছে দুজন গবেষকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। ইনারা হলেন ড. একমেলেদিন ইসানাগলু এবং ড. টায়ার আল্টিকুলেচ।

ড. ইসানাগলু তুরস্কের রাষ্ট্রদূত, এমপি ও রাজনীতিবিদ। এছাড়াও তিনি ২০০৪-২০১৪ পর্যন্ত OIC-এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। বিজ্ঞানের উপরে পিএইচডি ধারী ব্যক্তিটি ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে হিস্টোরি অব সাইন্সের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কোরানিক স্টাডিজের উপরে নেতৃস্থানীয় স্কলার। ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর তোপকাপি পাণ্ডুলিপি দেখা শোনার দায়িত্বে ছিলেন। পাণ্ডুলিপিটির ব্যাপারে তিনি ৮৩ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন। বইটির নাম 'আল-মাশাফ-শরীফ'।

বইতে তিনি বর্ণনা করেছেন, *তোপকাপি ম্যানুস্ক্রিপ্ট (মাশাফ) উসমানের পাণ্ডুলিপি না। আমাদের কাছে উসমানের কোরানের একটিও কপি নেই। এই পাণ্ডুলিপিগুলো উমাইয়া শাসনামলের পরে লিখিত হয়েছে।*[64] নেতৃস্থানীয় আরেকজন স্কলার হলেন টায়ার আল্টিকুলেচ। তিনি বলেছেন, *এই পাণ্ডুলিপির উপরে কোন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা হয়নি। এগুলো উসমানের সময়কার তো নয়ই, এমনকি এটি তার ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিও নয়। বরং অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটি লিখা হয়েছে। মক্কা থেকে উসমান কর্তৃক কোন পাণ্ডুলিপি কখনো পাঠানো হয়নি। তোপকাপি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বর্তমান কোরানের ২,২৭০টি ব্যঞ্জনবর্ণ জনিত পার্থক্য রয়েছে। এই মুশাফা প্রাচীন আরবি রীতিতে লিখিত হয়নি। যেমন: এর ধরণ, ক্যালিগ্রাফি বিবেচনা করে প্রতীয়মান হয়ে যে আরবি হাতের লিখা নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে। পাণ্ডুলিপির শব্দগুলো সোজা লাইনে লেখা হয়েছে। অক্ষরগুলো মিল বৈশিষ্ট্য সূচক ইরাব চিহ্ন, লাল রঙের কালি দিয়ে ইজম চিহ্ন, তির্যক লাইনে কালো কালিতে লেখা একই রকম অক্ষরগুলোর থেকে আলাদা। পাণ্ডুলিপিটি যে স্ক্রিপ্টে লেখা হয়েছে তার মাত্রা ও প্রতিভাস বিবেচনা করে বলা যায় পাণ্ডুলিপিটি হয়ত উমাইয়াহ শাসনকালের। আবার এটি হিজরী ১৬০-২৫০ বছরের মধ্যেও লিখিত হয়ে থাকতে পারে।* এ বিষয়ে ড. ইসানাগলু আরও লিখেছেন, *কোরানের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর একটি খলিফা হজরত উসমানের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো বর্তমানে কোথায় কী অবস্থায় আছে? দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এর কোন ইতিবাচক জবাব আমাদের কাছে*

---

[64] Al-Mushaf al-Sharif Attributed to 'Uthman bin 'Affan", 2007:35

*নেই। এই পাণ্ডুলিপির হাতের লেখার ধরণ বিবেচনা করে বলা যায় এটি হজরত উসমানের কোরান না।*[65]

তাশখন্দের সমরখন্দ ম্যানুস্ক্রিপ্ট সম্পর্কে মুসলিম গবেষক আল্টিকুলেচ বলেছেন, *মুসলিমদের বিশ্বাস এটি খলিফা উসমানের চারটি প্রেরিত পাণ্ডুলিপিগুলোর একটি এবং এটি থেকেই বর্তমানের কোরানের সুত্রপাত। এই পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করার সময় তিনি শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এটি খলিফা হজরত উসমানের পাণ্ডুলিপি বা তার ব্যক্তিগত কোরান ছিল না।*[66] *ছয়টি কারণে এটি মূল পাণ্ডুলিপি হতে পারে না। পাণ্ডুলিপিতে বানানের নিয়ম রক্ষা করা হয়নি, একই শব্দ বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে, অনুলিপি করতে গিয়ে ভুল করেছে, যে লেখক এটি লিখেছে তার পাণ্ডুলিপি লেখার অভিজ্ঞতা ছিল না, আয়াতের চিহ্ন দেয়ার পর অর্থ যোগ করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি তাশখন্দ পাণ্ডুলিপি খলিফা উসমানের শহীদ হওয়ার সময়ে পাঠ করা পাণ্ডুলিপি না; কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত পাণ্ডুলিপিগুলোর একটিও না; বা মদিনার জনগণের পাঠের সুবিধার জন্য এটি রাখাও হয়নি। যিনি এটি লিখেছেন তিনি আরবি ভালোমতো জানতেন না। কোরানের ১১৪টি সুরার মাঝে এটিতে মাত্র ৪৩টি রয়েছে।*[67]

উক্ত পাণ্ডুলিপি দুটি নিঃসন্দেহে মুসলিমদের মূল পাণ্ডুলিপি না। এছাড়াও ড. টায়ার আল্টিকুলেচ কায়রোয় অবস্থিত আল হুসাইনি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। পাণ্ডুলিপিটির ব্যাপারে তিনি বলেছেন, এই পাণ্ডুলিপিটিও উসমানের না। এটি অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত। খুব সম্ভবত আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ান কর্তৃক লিখিত। তিনি মিশরের গভর্নর ছিলেন।[68]

অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত কোরানের আরও একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এটিও কোরানের সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর মাঝে একটি। প্যারিসে অবস্থানরত এই পাণ্ডুলিপিটির নাম

---

[65] Al-Mushaf al-Sharif: 2007:35,10

[66] Al-Mushaf al-Sharif’ 2007:65

[67] Al-Mushaf al-Sharif’ 2007:71-72

[68] Al-Mushaf al-Sharif’ 2007:36, footnote 14a

‘প্যারিস পেট্রোপলিটেনাস ম্যানুস্ক্রিপ্ট।’ ড. ফ্রাঁসোয়া ডোরোশ এই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার মতে, *পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি লেখক মিলে পাঁচটি ভিন্ন অনুলিপি তৈরি করেছেন। প্যারিস পেট্রোপলিটেনাস যখন লিখিত হয় তখন অন্য চারটি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এর হুবহু মিল ছিল না। অনেক জায়গায় সংশোধন করে আয়াত ঠিক করা হয়েছে এবং সেগুলোর শেষে একটি বিশেষ চিহ্নও দেয়া রয়েছে।*[69] ড. ডোরোশ এই বিষয়ে লিখেছেন, *এই কোরানটির সঙ্গে কায়রো এডিশন কোরানের রজম তুলনা করলে দেখা যাবে এর অনেক শব্দ ভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। কোরানের বানান শুদ্ধ করণ প্রক্রিয়াকে অনেকটা ‘স্ক্রিপ্টো ডিফেকটিভা’র সঙ্গে তুলনা করা যায়।*[70] *খলিফা আব্দুল মালেক এবং আল হাজ্জাজ দ্রুত পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শেষ করতে চাইছিলেন। তাই অন্য কোরানের সঙ্গে অনেক আয়াতে পার্থক্য থাকার কারণে এই কোরানটি ফেলে না দিয়ে অন্যান্য কোরানের সঙ্গে মিল রাখতে গিয়ে যে আয়াতগুলোতে সমস্যা রয়েছে সেগুলো মুছে ফেলে তার উপর দিয়ে নতুন ভাবে আয়াত লিখে দেন। এরপরও কায়রো এডিশনের কোরানের সঙ্গে প্যারিস পেট্রোপেনাসের ৯৩ টি স্থানে পার্থক্য থেকে গেছে।*[71]
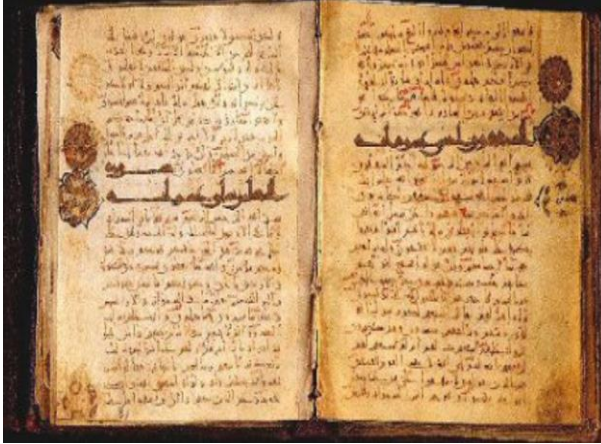
চিত্র: প্যারিস পেট্রোপেনাস পাণ্ডুলিপির সংশোধিত আয়াত সমূহ।

---

69 Deroche 2009:173
70 Deroche 2009:173
71 Deroche 2009:174

*পরবর্তীতে হাতে লিখিত পরিবর্তনগুলোর যে চিহ্ন ছিল তাও ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া পাণ্ডুলিপিতে কিছু টেক্সট কায়রো ও অন্য কোরানগুলোর সঙ্গে মেলে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কোরানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে মুসলিমদের যে দাবী রয়েছে তা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ মুসলিম নেতা আব্দুল মালেক ও আল হাজ্জাজের আদেশক্রমে হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ইসলামের উন্নতি সাধন নয়, ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যাবহারের জন্য। পয়গাম্বর এবং তার চার খলিফার সমস্ত ভৌত সম্পর্কগুলোকে আব্দুল মালেকের এবং আল হাজ্জাজের এই উদ্যোগের মাধ্যমে মুছে ফেলা হয়।*[72]

আমাদের আলোচনা বিষয় ছিল সমরখন্দ ও তাশখন্দ পাণ্ডুলিপি দুটি কুফিক স্ক্রিপ্টে লিখিত। এখন প্রশ্ন হল, উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলো যদি কুফিক স্ক্রিপ্টে লেখা হয় তাহলে আরবের হিজাজ অঞ্চলে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে কোন লিখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো? নিঃসন্দেহে তৎকালীন আরবে কুফিক স্ক্রিপ্ট বা টানা হাতের লেখার প্রচলন ছিল না। প্রাচীন আরবের লেখনীগুলো সব খাড়া ও লম্বালম্বি বা আপরাইট ফরমেশনে লেখা হতো। গুরুত্বপূর্ণ এই আবিষ্কারটি করেছেন ওরিয়েন্টাল এন্ড ইন্ডিয়া অফিস কালেকশনের ড. হিউ গুডেকর।

আরব হিজাজে সে সময় আল-মাইউল ও মাশাক স্ক্রিপ্ট বিকশিত হয়, বিশেষ করে মক্কা ও মদিনায়। মদিনায় মাশাক স্ক্রিপ্টের প্রচলন বেশি ছিল। আল-মাইউল স্ক্রিপ্ট সপ্তম শতাব্দীতে বহুল ব্যবহৃত হত এবং এটি সহজেই চেনা যায়। এই স্ক্রিপ্টের হরফগুলো সামান্য বাঁকানো থাকে। 'মাইউল' শব্দের অর্থই বাঁকানো। স্বল্প ব্যবহার হতে হতে ব্যাবহারের অনুপযোগী হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি দীর্ঘ ২০০ বছর টিকে ছিল। মাশাক স্ক্রিপ্টের প্রচলনও শুরু হয় সপ্তম শতকে। অর্থাৎ, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই মাশাক স্ক্রিপ্ট টিকে ছিল।

মাশাক স্ক্রিপ্টও সপ্তম শতকে উদ্ভাবিত একটি স্ক্রিপ্ট। কিন্তু মাইউলের পরও বহু শতাব্দী ধরে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। মাইউলের তুলনায় এটি আরও বেশী

[72] Deroche 2009:178

আনুভূমিক এবং এটির মূল বৈশিষ্ট্য হল জড়ানো স্টাইলে বেশ সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে লিখিত হয়। কোরান যদি সপ্তম শতাব্দীতেই সংকলিত হয়ে থাকে তবে কোরান লেখা হতো মাইউল বা মাশাফ স্ক্রিপ্টে। মুসলিমরা এই দুটো পদ্ধতিতে লিখিত একটি কোরানও দেখাতে পারে না। তাহলে কি সপ্তম শতকের কোন কোরান বর্তমানে টিকে নেই? উত্তরটি হল, এখন পর্যন্ত সপ্তম শতকের কোন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি; তবে সর্বপ্রাচীন যে কোরানগুলো রয়েছে সেগুলোর কোনটাই মুসলিমদের দখলে নেই। রয়েছে ইহুদী নাসারাদের দখলে।

***

# সপ্তম শতাব্দীর কোরান

যাবতীয় প্রমাণ বিবেচনা করে পশ্চিমা স্কলারদের দাবী মুহাম্মদের মৃত্যুর ১০০ বছর পর্যন্ত কোন কোরানের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে টিকে নেই। ফলে নিশ্চিত ভাবেই তারা ধরে নেয়া যায় সপ্তম শতাব্দীর কোন কোরান আধুনিক সময়ে পাওয়া যাবে না। অপর দিকে মুসলিম স্কলারদের হাতে সপ্তম শতাব্দীর কোন পাণ্ডুলিপি নেই। এই অধ্যায়ে আমরা কোরানের সবচাইতে পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখবো সপ্তম শতাব্দীর কোন কোরান আদৌ আছে কিনা। উল্লেখ্য, উসমান যে সময় কোরান সংকলিত করেন তখন আরবে মাইউল ও মাশাক স্ক্রিপ্টের প্রচলন ছিল। এই দুটি স্ক্রিপ্টে লিখিত কোন কোরান মুসলিমরা দেখাতে পারে না। মজার ব্যাপার হল, মাইউল স্ক্রিপ্টে লিখিত একটি প্রাচীন কোরান রয়েছে বৃটিশ লাইব্রেরিতে। এটি কোরানের ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রাচীন কোরান। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কোরানটি দান করেন এর সাবেক কিউরেটর। তিনি নিজেও একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিলেন। বৃটিশ মিউজিয়াম ১৮৭৯ সালে এটি ব্রিটিশ লাইব্রেরির নিকট বিক্রি করে দেয়। মাইউল কোরানের পাণ্ডুলিপিটি অষ্টম শতকের শেষের দিকে লিখিত। অর্থাৎ, এটি সপ্তম শতকের কোরান না।

চিত্র: বৃটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মাইউল কোরান।

ব্রিটিশ লাইব্রেরির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পাণ্ডুলিপিটির পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করে যেকেউ এটি পড়তে পারে। অন্যান্যগুলোর মতো এটিও সম্পূর্ণ কোরান না। পাণ্ডুলিপিতে সুরা আরাফের (৭) শেষ অংশ থেকে সুরা আনফালের শুরুর কিছু অংশ রয়েছে। এছাড়াও পুরো পাণ্ডুলিপিতে কিছু কিছু সুরার অংশ বিশেষ লেখা রয়েছে এবং সুরার নামগুলো লাল কালি দিয়ে লিখিত। পাণ্ডুলিপিটি হিজাজ অঞ্চলে লেখা হয়েছে। কোরানটি দেখেই বোঝা যায় এটি পাকা হাতের কাজ। এই কোরানের হরফগুলো বাঁকানো ভাবে লেখার পাশাপাশি আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন কোরানে লক্ষ্য করা যায়নি। যেমন, ‘আলিফ’ হরফটি নিচের দিকে বাঁকানো নেই, এবং ‘ইয়া’ হরফ শব্দের শেষে ব্যবহার করা হয়েছে।

কোরানের আরেকটি উল্লেখ যোগ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট হল বার্মিংহাম ম্যানুস্ক্রিপ্ট। এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটির উপরে বিবিসি ‘The oldest Koran fragment found at Birmingham University’ শিরোনামে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে। উক্ত আর্টিকেলটিতে পক্ষপাত মূলক আচরণের জন্য সেক্যুলার হিস্টোরিয়ান ও কোরান স্কলাররা তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিবিসির আর্টিকেলে লেখা হয়েছে, রেডিও কার্বন

টেস্টের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির রেডিওকার্বন একসেলটর ইউনিট এই ফলিওর কার্বন টেস্ট করে। জার্মান কোরানের পাণ্ডুলিপি Corpus Coranicum এর রেডিও কার্বন টেস্টের বিজ্ঞানীরা এই পাণ্ডুলিপির টেস্ট করার জন্য শ্রম দিয়েছেন। তারা এখন পর্যন্ত ৩০ টিরও বেশি কোরানের রেডিওকার্বন ডেটের পরীক্ষা করেছে। উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপিটির মাত্র দুটো ফলিও খুঁজে পাওয়া গেছে। ফলিওগুলো সপ্তম শতকের শেষভাগে লিখিত। রেডিও কার্বন টেস্ট অনুযায়ী এর পার্চমেন্টের বয়স ৫৫৮ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ। আমরা আগেই বলেছি রেডিও কার্বন টেস্টের মাধ্যমে ফলাফল ৯৫% সঠিক হওয়া সম্ভব। মনে রাখতে হবে রেডিও কার্বন টেস্টে যে সময় বেড়িয়ে আসে তা পাণ্ডুলিপি লিখনের সময় না। ৬৪৫ হল যে ঐ পার্চমেন্টটি যে পশুর চামড়া থেকে তৈরি সেটির মৃত্যুর সময়। উক্ত চামড়াটি ব্যবহারযোগ্য হতে আরও কয়েক বছর এমনকি দশকও লেগে যেতে পারে। রেডিও কার্বনের ডেট যদি পাণ্ডুলিপি লিখিত হওয়ার সময় হয় তবে সানাই ম্যানুস্ক্রিপ্ট মুহাম্মদের নবীত্ব লাভের আগে লিখিত হয়েছে। পশু হত্যা করার পর সেই পার্চমেন্টট লিখিত হলে তবে বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, পার্চমেন্টের লেখা মৃত পশুর ব্যাকটেরিয়ার জন্য মুছে যেতে পারে, পার্চমেন্ট পচে যেতে পারে। তবে অভি লুইসের মতে, রেডিও কার্বনের ডেটিং অনুযায়ী ফোলিও দুটি ৫৬৮-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত, এবং ফোলিওর কালি মুছে যাবার পর পার্চমেন্টটি আবার লিখিত হয়েছে আনুমানিক ৬১০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ কোরান নাযিলের সময়ে, অথবা এটি মুহাম্মদের বাল্যকালে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের সময়ের হয়ে থাকতে পারে। অভি লুইয়েস গবেষণার ফলাফল ত্বাহা হোসাইনের ১৯২৬ সনের বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন, কোরান প্রাক-ইসলামিক যুগের ছন্দময় কাব্য ছিল। উক্ত ফলিও দুটি হয়ত তারই অংশ। মনে রাখতে হবে এটি কোন পাণ্ডুলিপির অংশ না। এটি চার পৃষ্ঠার দুটি সম্পূর্ণ ফোলিও মাত্র।

চিত্র: বার্মিংহাম কোরান ফোলিও

বার্মিংহামের এই ফোলিওতে চার ধরণের ডায়াক্রিটিকাল বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, অর্থহীন পাঠ। তাছাড়াও কোরানের ভিন্ন পাঠের সমস্যা ফোলিও দুটিতে পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রাচীন সমস্ত ম্যানুস্ক্রিপ্টে ভিন্ন পাঠ জনিত সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যর ফলে ক্লাসিক্যাল ইসলামিক মৌলিক দর্শনে কিছুটা প্রভাব পড়বে। এছাড়াও আয়াতের ক্রমিক ভিন্নতা এই ফোলিওতে পাওয়া গেছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে এত প্রাচীন একটি ফোলিওতে এত শক্ত পেজ লেআউট ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে এ ধরণের হিজাজি হাতের লেখা, ক্রমিক অনুসারে সাজিয়ে আয়াতের বিভক্তি, এবং সুরা বিভাজন রয়েছে। কেননা কোরানে এই জিনিষগুলো আরও অনেক পরে যোগ করা হয়। এটা শুধু একটি ম্যানুস্ক্রিপ্টই না, বরং বেশিরভাগ মুসলিম ও পশ্চিমা স্কলারদের মতে এটি আরবি সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন কোন রচনা।

পাঠের ভিন্নতা সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোরানের পাঠের ভিন্নতা এড়ানোর জন্য একটি মৌলিক পাঠ বেঁছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ড. ব্রুবেকার তার থিসিসে প্রমাণ করেছেন অষ্টম ও নবম শতকের ১০টি বড় কোরান বিশ্লেষণ করে ৮০০টিরও বেশী ভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে; এবং ভিন্ন পাঠগুলো পরবর্তী ২০০ বছরে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কোরানে সংশোধন করা হয়েছিল। অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতকের দশটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির

ভিন্ন পাঠগুলো সংশোধন করতে দশম ও একাদশ শতাব্দী লেগে যায়। কোরানের একই সঙ্গে প্রাচীন ভিন্ন পাঠ বিবেচনা থেকে অনুমান করে নেয়া যায়, বিশাল সংখ্যক ভিন্ন পাঠের নিদর্শন কোরানের চাইতে হাদিসগুলোতে সংরক্ষিত ছিল। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের সময়কাল থেকেই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীদের কোরানের সঠিক উচ্চারণ, বানানের প্রতি জোর করে আসছিল। অথচ সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত মুসলিমদের কোরানের উচ্চারণ, বানান পদ্ধতিকে বর্জন করা হয়েছিল, কিন্তু তবুও প্রাচীন মুসলিম স্কলাররা এটা মেনে নেন।

বর্তমান সময়ের কিছু মুসলিম এই আবিষ্কারের প্রতি সন্দেহ পেষণ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত কিং ফয়সাল সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের ডিরেক্টর সাদ আল-সারহান বার্মিংহামের এই আবিষ্কার ও এর সময় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার মতে, এক অথবা দুই শতাব্দীর ভেতরে কোরানে কোন প্রকার নোক্তা যোগ ও সুরা-পারা ইত্যাদি বিভাজন করা হয়েছিল না। তিনি দাবী করেন, পুরনো পাণ্ডুলিপির লেখা ঘষে তুলে ফেলে নতুন করে এই লেখা ঢোকানো হয়েছে। বার্মিংহাম ফোলিও নিয়ে মুসলিমদের উভয়সঙ্কটের কারণ বোঝা খুব কঠিন কিছু না। কার্বন ডেটিং থেকে ফোলিও দুটির যে সময় বেড়িয়ে এসেছে তা মুসলিমদের সৃষ্ট ইসলামী অস্তিত্বের (৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ) পূর্বে চলে যায়। সাদ আল-সারহানের দাবী পুরোপুরি অনর্থক। কেননা, আমরা দেখি যে বার্মিংহাম ফোলিও কোন প্রকার লোয়ার টেক্সট ও আপার টেক্সট নেই। আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির আপার-লোয়ার টেক্সট বোঝা যায়, অথচ বার্মিংহাম ফোলিওতে তার উপস্থিতি দেখা যায় নি। ফলে টেক্সট মুছে গিয়ে পরবর্তীতে তা লেখা হয়েছে এমন ভাবনার কোন কারণ নেই। একটি কথা বলতেই হয়, রেডিও কার্বন ডেটিং এ যে সময়কাল বেড়িয়ে এসেছে তা এই কোরানের ফোলিও নিয়ে শেষ বাক্য না। এখানে একটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যা সমাধান করতে আরও সময় ও ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। এই পাণ্ডুলিপিটি যারাই বানিয়ে থাকুক না কেন মুসলিমদের কার্বন ডেটিং মেথডের সময় নির্ণয়কে গ্রহণ করা করা প্রয়োজন। স্ক্রিপ্ট অ্যানালাইসিস, আর্ট

অ্যানালাইসিস, ম্যানুস্ক্রিপ্ট অ্যানালাইসিসের ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি সহ এর সমস্ত ভৌত অংশকে আবারও টেস্ট করানো দরকার। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলকে একেবারে ফেলে দেয়া সম্ভব না। এই ফলাফলই ম্যানুস্ক্রিপ্টটিকে নিখুঁতভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

বার্মিংহাম ফোলিও দুটির দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া যাক, ফোলিওতে দুটি পৃষ্ঠা রয়েছে। যার ভেতরে এক দিকে সুরা ১৮, ১৯ এবং ২০ এবং অপরদিকে ১৯ এবং ২০ নং সুরার কিছু অংশ রয়েছে। বর্তমান কোরানের তুলনায় অন্তত পক্ষে ২৭টি আলিফ এই সুরাগুলোতে নেই। বর্তমানের প্রামাণিক ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্নগুলোর সঙ্গে এই ফোলিওর ৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্নের তারতম্য দেখা গেছে। এর সঙ্গে আবৃত্তি পাঠগুলোর ৩টির কোন মিল নেই। তেলাওয়াত কারী ইবনে আমরের তেলাওয়াতের সঙ্গে এই ফোলিওর পাঠ মিলে যায়। তিনি সুরা আল-কাহাফের ১৮:২৬ এর 'তাশরিকু' (আপনি অংশীদার বানান) ক্রিয়াপদকে 'ইয়ুশরিকু' (তিনি অংশীদার বানান) উচ্চারণ করেন। বর্তমান কোরানে পুরো বাক্যটি আছে এমন, 'তিনি কাউকে স্বীয় কর্তৃত্বের অংশীদার বানান না।'

ফোলিওতে যে তিনটি সুরা রয়েছে তাতে আয়াতগুলো বর্তমান সুরার আদলে সাজানো নেই। এছাড়া ফোলিওতে এমন ধরণের 'কাফ' ব্যবহার করা হয়েছে যা বর্তমানে শুধু ওয়ারশ কোরানেই পাওয়া যায়। (যেমন: কাফে একটি নোক্তা আছে, এবং ফা'য়ে কোন নোক্তা নেই) এই ফোলিও নিয়ে শেষ বাক্য হিশেবে বলা যায়, কোরান যদি পরিপূর্ণ ভাবে খাঁটি, নিখুঁত ও অপরিবর্তিত হয়েই থাকে তাহলে এই পার্থক্যগুলো থাকার কথা ছিল না। কোরান প্রাক-ইসলামি যুগের কাব্য সাহিত্যে এই দাবীর স্বপেক্ষে তাত্ত্বিক প্রমাণ গবেষকরা এত দিন দিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাদের হাতে কোন আর্কিওলজিকাল প্রমাণ ছিল না। এটা হলো তাদের আর্কিওলজিকাল প্রমাণ। এই প্রমাণই সাক্ষ্য দিচ্ছে নবুয়তের মুহাম্মদের পূর্ব থেকেই কোরানের বিভিন্ন অংশ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পরের পৃষ্ঠায় আমরা ফোলিও দুটির পূর্ণ

চিত্র তুলে দিয়েছি, এবং পাঠকদের বোঝার সুবিধার জন্য অর্থগুলো তুলে ধরেছি যেন পাঠকরা নিজেই তা বিচার করে নেন।

পৃষ্ঠা ১ সম্মুখভাগ : সুরা ১৯:৯১-২০:১৩ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে পারবেন না এর বিবৃতি (৯১-৯৪); যে সকল মানুষ তার গোলামি স্বীকার করবে তাদের জন্য ভালোবাসা ও অস্বীকার কারীদের তিনি ধ্বংস করে দেন (৯৫-৯৮); কোরান সহজ সরল, এবং মানুষকে সতর্ক করার জন্য(২০:১-৪); কোরান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে (৫-৮); আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা (৯-১৩);আগুনের মাধ্যমে আল্লাহ ও মুসার কথপোকথন।
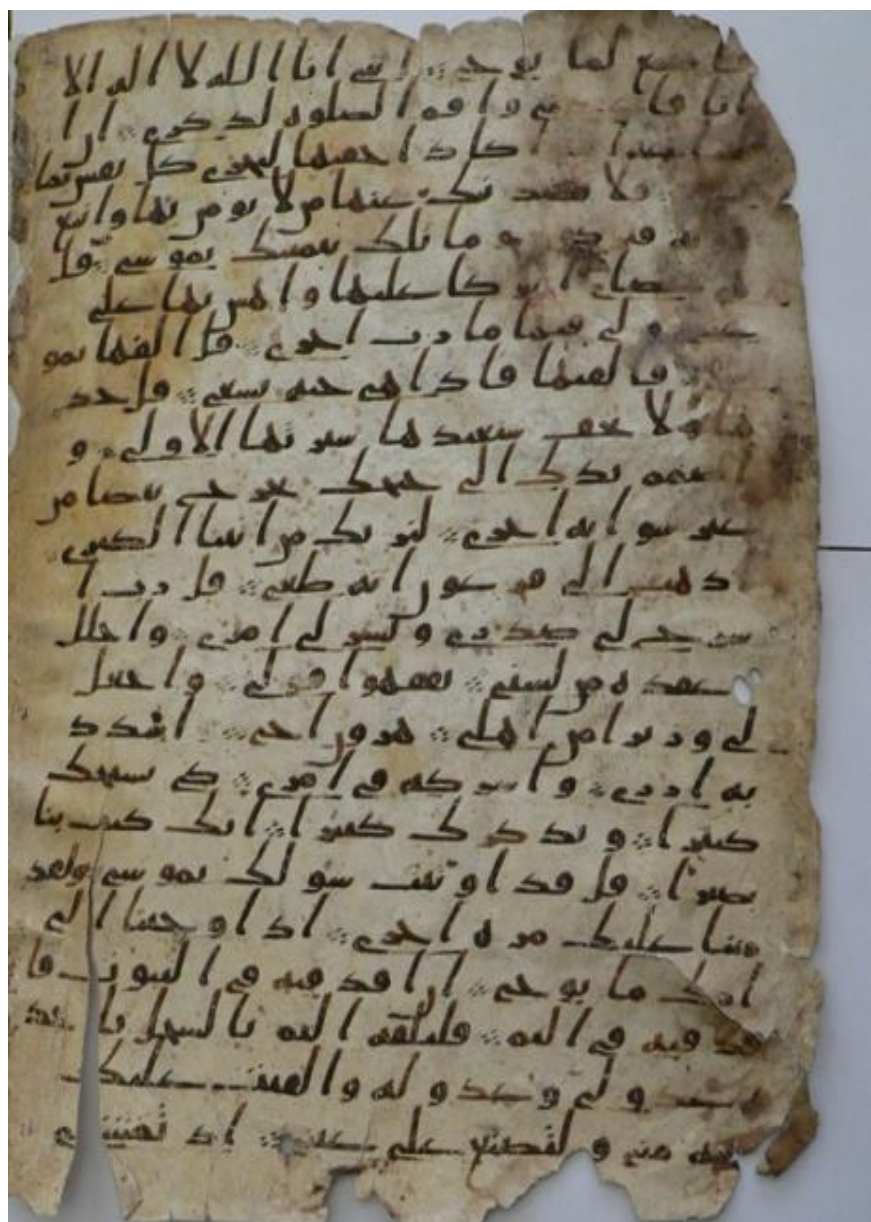
পৃষ্ঠা ১ পৃষ্ঠভাগ: সুরা ২০:১৩-৪০ আল্লাহর উপাসনা করো নয়তো মরো (১৩-১৬); হারুনের সহিত মুসাকে ফেরাউনের কাছে প্রেরণ (১৭-৩৭); মুসার শিশুকালের বর্ণনা।

পৃষ্ঠা ২ সম্মুখভাগ: ১৮:১৭-২৩ কাহাফ বাসীর বর্ণনা। [কোরানে ১৭-২৬ নং আয়াত]

পৃষ্ঠা ২ পৃষ্ঠভাগ ১৮:২৩-৩১ জান্নাত-জাহান্নামের রগরগে বর্ণনা। [কোরানে ২৯-৩১ নং আয়াত]

সপ্তম শতাব্দীর শেষে অথবা অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে লিখিত আরেকটি পাণ্ডুলিপি হল সানাই পাণ্ডুলিপি। সানাই পাণ্ডুলিপি ঐতিহাসিকদের জন্য একটি গুপ্তধন। এর রহস্য এখনও পুরো ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করে। ইয়েমেন সরকার জার্মান গবেষকদের এই পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের কোন অনুমতি দেয়নি। এর অনুমতি পাওয়া গেলে সর্বপ্রাচীন কোরানের একটি বড় অংশ জনসম্মুখে উন্মোচিত হবে। মুসলিমদের দাবী কোরানের একটি বিন্দু পর্যন্ত বদলায়নি।[73] বর্তমান কোরানের মূল এবং অবিকৃত কপিটি লাওহে মাহফুজে গোল্ডেন ট্যাবলেটে খোদিত রয়েছে।[74] একই সঙ্গে কোরানের আয়াত বদলানোর হাস্যকর ঘটনা আমরা কোরানেই দেখতে পাই।[75] আয়াত ভুলে যাওয়ার ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে ঘটেছে।[76]

সানাই পাণ্ডুলিপি ইয়েমেনের গ্রেট মস্ক অব সানাইয়ের চিলেকোঠা থেকে উদ্ধার করা হয়। কার্বন ডেটিং প্রমাণ করে এটি ধর্মীয় রেষারেষি বা ইসলামের বিশ্বাসে আঘাতের জন্য পরবর্তীতে বানানো হয়নি, কিংবা এটি ইহুদী খ্রিষ্টানদের দ্বারাও আবিষ্কৃত হয় নি। সানাই পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার সম্ভবত গত ১৪০০ বছরের ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে বিব্রতকর ঘটনা। সানাই ইসলামের সর্ব প্রাচীন মসজিদগুলোর একটি। আরবদের দ্বারা মসজিদটি পেত্রার দিকে কিবলা রেখে নির্মাণ করা হয় ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মসজিদের প্রচুর রদবদল ঘটেছে। ১৯৭২ সালে ভারী বৃষ্টিতে মসজিদের পশ্চিম দেয়াল ধ্বসে পড়ে। সেকারণে নির্মাণ শ্রমিকরা বাহিরের এবং ভিতরের ছাদের ক্রাউন স্পেস পুনর্নির্মাণ করছিল। মসদিজের সঙ্গে লাগোয়া একটি পুরনো কবরস্থান বারবার শ্রমিকদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছিল। মসজিদ কোন কবরস্থান না; এখানে মানুষের হাড়গোড়, লাশ, ধ্বংসাবশেষ রাখা হয় না। এই বিষয়টি শ্রমিকরা কোন গুরুত্ব দেয় নি। অথচ এখান থেকেই হাজার বছরের পুরনো আরবি লিখা সম্বলিত প্রায় ছেঁড়া, ভেজা, দোমড়ানো, মণ্ড পাকানো কিছু

---

[73] Sura:10:64; 6:34
[74] Sura: 56: 77-78; 85:21-22
[75] Sura:2:106
[76] Sura:3:194

পার্চমেন্ট পাওয়া যায়। অশিক্ষিত শ্রমিকেরা পাণ্ডুলিপিটি জড়ো করে প্রায় ২০টি ভাগে আলুর ঠোঙার মত দলা পাকানো অবস্থায় মসজিদের মিনারের স্টেয়ারকেসে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়। পাণ্ডুলিপিটি আবারও হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে। এরপর প্রেসিডেন্ট অব ইয়েমেন অ্যান্টিক অথোরিটির প্রধান আল আকওয়া এই জিনিস খুঁজে পেয়ে সেটির গুরুত্ব অনুধাবন করেন। আল আকওয়া পাণ্ডুলিপিটির আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করাতে চাইছিলেন। ইয়েমেনের মতো আরবি ভাষা-ভাষী একটি দেশেও এমন কোন স্কলার ছিলেন না যিনি এই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন। থাকলেও আল-আকওয়া তাদের ভরসা করেন নি। ১৯৯৭ সালে তিনি খুঁজে পান অমুসলিম জার্মান স্কলার ড. পুইনকে। ইয়েমেন সরকারের সাহায্যে ড. পুইনকে এই পাণ্ডুলিপিটির গবেষণায় নিয়োগ দেয়া হয়। পুইন আরবি ক্যালিগ্রাফি, কুরানিক পলিওগ্রাফ্রির উপরে পৃথিবীর অত্যন্ত খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। দশ বছর ধরে তিনি মূল্যবান পার্চমেন্ট নিয়ে গবেষণা করেছেন।
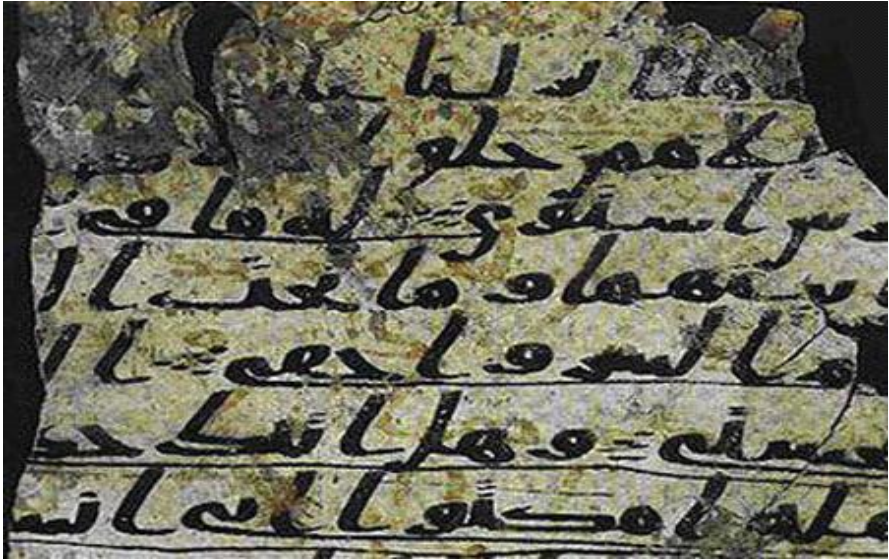
চিত্র: জেরার্ড আর পুইনের তোলা সানাই পাণ্ডুলিপির একটি টুকরো[77]

[77] Photo Source: Wikipedia, 2009

সানাই পাণ্ডুলিপি প্রজেক্ট শুরু হলে প্রাথমিকভাবে এর দশ হাজার টুকরো উদ্ধার করা হয়, এবং এর সাথে বর্তমান কোরানের ১০,০০০টি পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। মুসলিমরা প্রাথমিক যুগে কোরানের অন্যান্য কপিগুলো নষ্ট করতে এত মরিয়া ছিল যে লুণ্ঠনকারী দলের হাত থেকে রক্ষা করতে এই পাণ্ডুলিপিটিকে কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে, এমন কবর যেটিকে পৃথিবীবাসীর নজরের আড়াল করতে মসজিদ ব্যবহার করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় কোরানের প্রাথমিক যুগ শিক্ষা-দীক্ষার তুলনায় কোরানের প্রসার ও অন্য পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার দিক থেকে কতটা মরিয়া ছিল।

চিত্র: পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার হওয়ার সময়ের অবস্থা[78]

কার্বন ডেট জানায় এই পার্চমেন্টের বয়স ৬৪৫-৬৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি। আসল বয়স হয়ত আরও কম। কেননা C-14 এর আনুমানিক বয়স ধরা হয় পার্চমেন্টটি যে পশুর চামড়া দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সেটির মৃত্যুর পর থেকে। কিন্তু পার্চমেন্টের ক্যালিগ্রাফি ডেটিং বলছে ৭১০-৭১৫ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয়। এছাড়াও পার্চমেন্টে এমনও অনেক ফ্রাগমেন্ট রয়েছে যা পার্চমেন্টের মূল বয়সের

[78] Photo Source: Dreibholz, 1999, p. 23

৬০ বছরের পরের। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এটি উসমানের সময়ের কোরান নয়, এবং সেই অনুপাতে বর্তমানের কোরানের সঙ্গে এর মিল থাকার কথা ছিল, তাও এটায় নেই। ১৯৮৩-১৯৮৬ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিটি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফ্রাগমেন্ট উদ্ধার করা হয়। আনুমানিক ১৫,০০০-৪০,০০০ পৃষ্ঠা। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সনাই ম্যানুস্ক্রিপ্টের মূল উৎস আরবের হিজাজ অঞ্চল।

**Table 1.** ***Result of Radiocarbon Dating. The graph gives, in five-year increments, the probability (%) that the parchment is older than a certain date AD, while the table to the right gives the probabilities for selected years.***

| Date (AD) | Probability that the parchment is older |
|---|---|
| 635.5 | 56.2 % |
| 645.5 | 75.1 % |
| 655.5 | 91.8 % |
| 660.5 | 95.5 % |
| 670.5 | 98.8 % |
| 675.5 | 99.2 % |
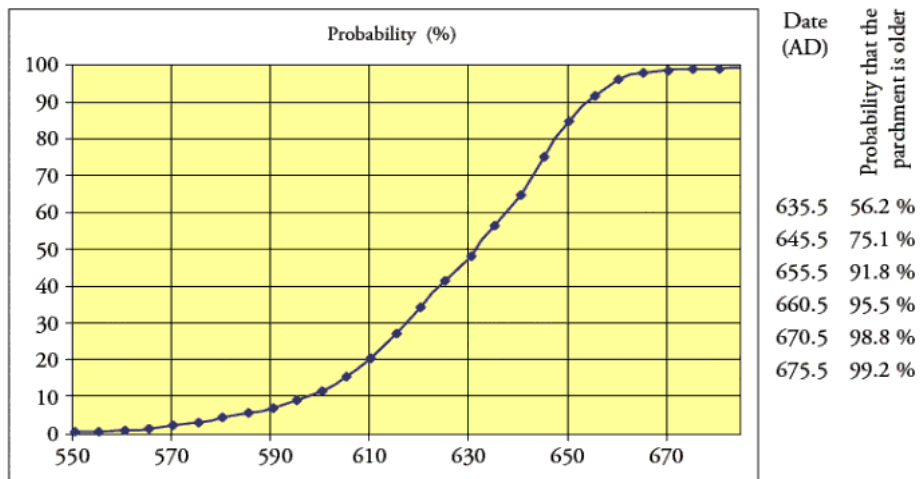
সানাই পাণ্ডুলিপিতে লোয়ার টেক্সট ও আপার টেক্সট দুটোই রয়েছে। লোয়ার টেক্সট হল পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক সময়ের টেক্সট। লেখা পুরাতন হয়ে গেলে, মুছে গেলে, বা পড়ার অযোগ্য হয়ে গেলে তা পুরোপুরি ধুয়ে ফেলে পাণ্ডুলিপিতে নতুন করে যে টেক্সট লেখা হয় তা আপার টেক্সট। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ করে পাণ্ডুলিপির লোয়ার টেক্সট পড়া সম্ভব। কার্বন ডেটের ফলাফল নিচে তুলে ধরা হল। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ৪৩ বছর পর লোয়ার টেক্সট লেখা হয়।

সেটি উসমানিক পদ্ধতিতে লিখিত কোরান নয় বলে স্বীকার করেছেন মুসলিম স্কলাররা।

| Date of manuscript: | Probability: |
|---|---|
| 4 years after the Prophet's death | 56.2% |
| 14 years after the Prophet's death | 75.1% |
| 43.5 years after the Prophet's death | 99.2% |

উল্লেখ্য উপরের দুটো টেস্টের রেজাল্টের চিত্র মুসলিমদের দ্বারা তৈরিকৃত। ড.পুইনের গবেষণার ফলাফলের সাথে এর পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো।

কোরানটির হাতের লেখা ও ধরণ শৈলী দুটোই ড. পুইনকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তার থেকেও বেশী অবাক হয়েছেন যখন দেখেন বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড কোরানের সঙ্গে এর অমিল প্রচুর। এর আয়াতের অনুক্রমের সঙ্গে বর্তমান কোরানের আয়াতের ক্রমিক সংখ্যার কোন মিল নেই। ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পাঠগত ভিন্নতা, আলাদা বানান পদ্ধতি, এবং ডেকোরেশনের ভিন্নতার কারণে যেকারও চোখ কুঁচকে উঠতে বাধ্য। অর্থোডক্স মুসলিমদের বিশ্বাস কোরান অপরিবর্তিত একটি গ্রন্থ এই তত্ত্ব সানাই পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে টেকে না। কোরান থেকে যে নূরের জ্যোতি বের হতো সানাই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পর থেকে তা একেবারে নিভে গেছে।

ড. পুইন বলেছেন, ‘সানাই পাণ্ডুলিপির গবেষণার বিষয়টি ইয়েমেনি সরকার গোপন রাখতে চেয়েছিল। আমরাও সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে বিষয়টি গোপন রাখি। ইয়েমেনিরা কখনোই চায়নি পাণ্ডুলিপিটির গবেষণার ফলাফল সাধারণ জনগণ কোনভাবে জানুক।’ ড. পুইন পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মুখ বন্ধ

রেখেছিলেন কেননা, তারা চাননি ইয়েমেন কর্তৃপক্ষ মাঝপথে প্রজেক্ট বন্ধ করে দিক। এটিকেই ড. পুইন 'সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণ' বলে অবহিত করেছেন। ড. পুইন খেয়াল করেন তার সঙ্গে ড. ওয়েন্সবার্গের গবেষণার ফলাফল মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। ওয়েন্সবার্গের মতে কোরান সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত হয়, এবং দীর্ঘ মৌখিক প্রথা বা ওরাল ট্র্যাডিশনের কারণে ততদিনে কোরান অনেকটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানের কোরানের ভিন্ন ভিন্ন পাঠের পার্থক্যগুলোই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের কোন দলিল বর্তমানে টিকে নেই, এর একমাত্র কারণ হল ওগুলো কখনো ছিলই না। সানাই ম্যানুস্ক্রিপ্টের যে পার্চমেন্টটি পাওয়া গেছে তা ইসলামের ইতিহাসে প্রাপ্ত সবচেয়ে পুরনো পার্চমেন্ট বা কাগজ। উক্ত পাণ্ডুলিপির অর্ধেকেরও বেশী হরফ এতটাই অস্পষ্ট যে তা বোঝার জন্য নোক্তা ব্যবহার করতে হবে। ক্রিয়া পদ যোগ করে পাঠের ভুল এড়ানো সম্ভব। অর্থোগ্রাফির মাধ্যমে জিওগ্রাফিকাল ট্র্যাডিশনের বিভিন্ন স্কুলের (কোরানের ভিন্ন পাঠ) ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া গেছে।

প্রাক-ইসলামী যুগের অনেক সৌর্স কোরানের মাঝে ঢুকে গিয়েছিল। আস-শাবাব-আর-রাস ও আস-শাবাব-আল গোত্রের কূপ নিয়ে বিবাদ আরব ঐতিহ্যের অংশ না। মুহাম্মদের সময়ের আরব বাসীরা তাদের ব্যাপারে জানত না। এছাড়া পুইন মানতে চান না যে কোরান খাঁটি আরবি ভাষায় রচিত। খোদ 'কোরান' শব্দটিই বিদেশী একটি শব্দ। কোরান শব্দের অর্থ 'আবৃত্তি করা' না। অন্য আর দশটি শব্দের মত কোরানও আরামিক শব্দ থেকে আরবি শব্দে প্রবেশ করে। 'Qariyun' শব্দটি কোরানের আদি শব্দ। এর অর্থ 'দেবতার সন্তুষ্টির জন্য দৈব বাণী পাঠ'।

পুইনের সহকর্মী বোথমার অত্যন্ত যত্ন সহকারে সানাই কোরানের ফ্রাগমেন্টগুলোকে প্রায় ৩৫,০০০টি মাইক্রোফিল্ম ছবি তুলে ১৯৯৭ সালে জার্মানিতে নিয়ে আসেন। এর ফলে বোথমার-পুইন ছাড়াও অন্যান্য স্কলাররা কোরানের এই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন। পুইন পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে একটি বই লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সায়েন্স ম্যাগাজিনে সংক্ষিপ্ত রচনা প্রকাশ করেন।

কোরানের পবিত্রতা খণ্ডন করতে গিয়ে পুইন লিখেছেন, “আমার বিশ্বাস, কোরান এমন এক ধরণের রচনার সমাহার যা মুহাম্মদের সময়ের লোকেরাও বুঝত না। কোরানের অনেক রচনা ইসলামের জন্মেরও ১০০ বছরের পুরাতন। কোরান নিজেকে পরিচ্ছন্ন বা মুবিন দাবী করে। কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন তবে বুঝতে পারবেন কোরানের প্রতি পাঁচটি বাক্যের একটির কোন অর্থ বোঝা যায় না। সত্যটা হল কোরানের এই পঞ্চম বাক্যটি দুর্বোধ্য। কোরান যদি বোধগম্য না হয়, এমনকি আরবিতেও যদি বোঝা না যায় তবে কোরানকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব। এটিই মুসলিমদের ভয়। বারবার কোরানকে ‘মুবিন’ দাবী করে, অথচ আরবি ভাষাতেই তা দুর্বোধ্য। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি। নিশ্চয় এর মাঝে কোন দুনম্বরি চলছে।”

সানাই পাণ্ডুলিপিতে অনেক স্থানে বিসরণ ঘটেছে। অর্থাৎ আয়াতের ক্রম এক সুরা থেকে বদলে হটাত করেই আরেক সুরার আয়াত ঢুকে গেছে। চিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সুরা উনিশ রয়েছে হিজাজি স্ক্রিপ্টে। আগেই আলোচনা করেছি হিজাজি স্ক্রিপ্ট সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ব্যবহৃত হত। হলুদ চিহ্নের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সুরা ১৯ থেকে সরাসরি ২২ নং সুরা শুরু হয়েছে। মাঝখানের ২০ ও ২১ নং সুরা গেল কোথায়? সম্পূর্ণ আলাদা স্ক্রিপ্টে সুরা ২১ শুরু হয়েছে পরের পৃষ্ঠায়। উক্ত স্ক্রিপ্টটি আরও পরের। এই দুটি পৃষ্ঠার মাঝখানে বয়সের পার্থক্য প্রায় ৬০ বছর। এটা আমাদের জানানো হয়নি কেন? ডান পাশের স্ক্রিপ্টটি ৭০৫ খ্রিস্টাব্দের, কিন্তু বাম দিকেরটি অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগের। কমলা রঙের চিহ্নগুলো লক্ষ্য করুন। ওগুলোকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট ভেরিয়েন্টস বা পাণ্ডুলিপির ভিন্নতা বলে। একটি পাণ্ডুলিপি থেকে আরেকটি পাণ্ডুলিপির শব্দ ও বাক্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে কমলা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। সানাই পাণ্ডুলিপিতে এমন ম্যানুস্ক্রিপ্ট ভেরিয়েন্ট আছে হাজারেরও উপরে।

নিচে আরেকটি পৃষ্ঠার ছবি দেয়া হল, যেখানে কিছু আধ্যাত্মিক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। যেমন, ‘কালু’ থেকে ‘কুল’ কখনো আব্রাহাম (s.2)আবার কখনো ইব্রাহীম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কালুর ৫০% আলিফ সাদা-কালো কাফ-লাম।
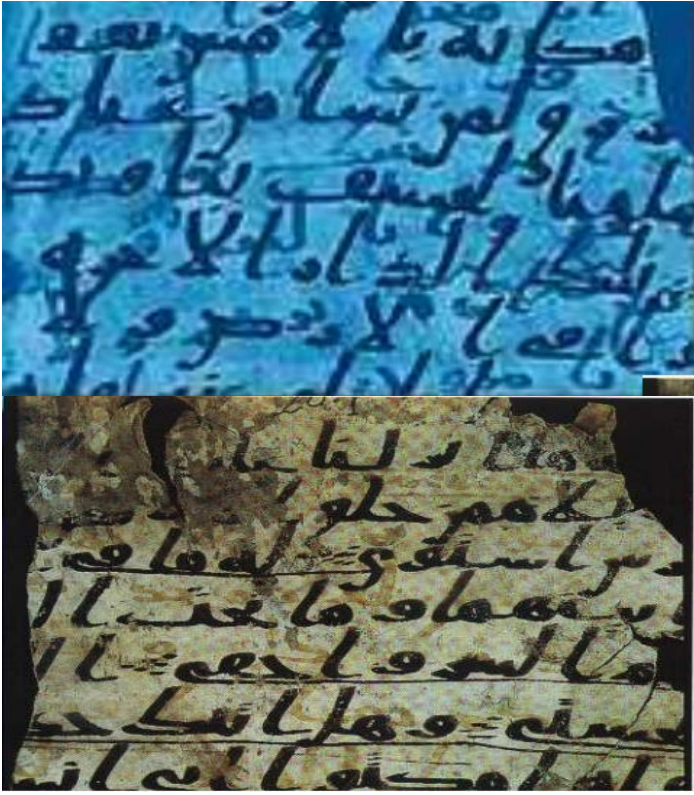
উপরের ছবিতে আমরা আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করে পাণ্ডুলিপির আপার স্ক্রিপ্ট ও লোয়ার স্ক্রিপ্ট পড়া যাচ্ছে। পশুর চামড়ার উপরে পাণ্ডুলিপি লেখলে তা অনেক সময় মুছে যায়, তখন সেটির উপরে আবার নতুন করে পাণ্ডুলিপি লেখা হয়। এই দুটো স্ক্রিপ্ট পর্যালোচনা করলে কোরানের স্ক্রিপ্ট বিবর্তন সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। গবেষকদের গবেষণা থেকে বের হয়ে এসেছে, লোয়ার স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছে আব্দুল মালেকের সময়কালে। মূলত, সপ্তম শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে। আপার স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছে আব্দুল মালেকের শাসনামলের ঠিক পরপরই। সম্ভবত মারওয়ান অথবা তার পুত্র ইবনে মালেকের সময়ে।

পুইনের এই অসামান্য আবিষ্কার অ্যান্ড্রু রিপিনকে মুগ্ধ করে। রিপিন এ ব্যাপারে বলেন, ‘ইয়েমেনি ম্যানুস্ক্রিপ্টের প্রভাব এখনও টের পাওয়া যায়। ভিন্ন পাঠ ও আয়াতের বিন্যাস এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবাই এই ব্যাপারে একমত। সানাই পাণ্ডুলিপি কোরানের প্রাচীন ইতিহাসকে এমনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে যে সন্দেহের উদ্রেক করে। কোরানের পাঠগুলো ছিল অস্থায়ী ও অপ্রামাণ্য, তবুও কোরানকে নিয়ে বারবার অযৌক্তিক দাবী করা হয়েছে।’ রিপিনের পর্যবেক্ষণ ছিল চমৎকার। ইসলামের শুরুর দিকে খিলাফত আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাবের চাইতে পলিটিকাল মুভমেন্ট ছিল বেশি। আরবের বিশাল সাম্রাজ্যে কোরানের মত একটি বই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কোরান একটি মর্যাদার প্রতীকের (status symbol) মত। এটা ছাড়া মুহাম্মদের মৃত্যুর পরপরই ইসলামের মৃত্যু ঘটত। কোরান নিঃসন্দেহে মানুষের তৈরি। এর সঙ্গে ঐশ্বরিক মশলা যোগ করে এটিকে সম্মানিত ও দামী হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রাচীন লেখকরা কোরানকে নিয়ে সমালোচনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেন নইলে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই কোরানের মুখ থুবড়ে পড়ার মত অনেক শক্তির উদ্ভব হত। এ বিষয়ে কোরানে বর্ণিত রয়েছে, *‘হে মুমিনরা। ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমরা দুঃখ পাবে। কোরান নাযিলের সময় প্রশ্ন করলে প্রকাশ হবে না। আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন, আল্লাহ ক্ষমা পরায়ণ, সহনশীল। ইতোপূর্বের সম্প্রদায় এ প্রশ্ন করেছিল তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।’*[79]

ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ঠিক কবে কীভাবে অন্ধ হয়ে যায় তা আমরা বলতে না পারলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় মুহাম্মদের পরবর্তী প্রাচীন মুসলিমরা বর্তমানের মুসলিমদের চাইতে বেশী লিবারেল ছিলেন। কোরানের বহু সংখ্যক আয়াতের সত্যতা নিয়ে অসংখ্য মুসলিম সে সময়ে প্রশ্ন তুলে ছিলেন। বিশেষ করে খারেজিরা যারা আলীর অনুসারী ছিলেন। নবী ইউসুফকে নিয়ে প্রচণ্ড অবমাননাকর একটি সুরার বিবরণ কোরানে রয়েছে। তাদের মতে এ ধরণের কামুক গল্প কোরানে

[79] Sura:5:101 & 5:102

থাকতে পারে না।[80] এই ধরণের দাবী করার সাহস বর্তমানে কোন স্কলারেরই নেই। প্রাচীন কোরানের স্কলাররা আরও বেশী নমনীয় ছিলেন এ দাবী সমর্থন করে রিপিন বলেন, 'প্রাচীন স্কলাররা স্বীকার করতেন কোরানের একটি অংশ হারিয়ে গেছে, বিকৃত হয়েছে এবং এত বেশী পাঠ দেখা গিয়েছিল যে সঠিক কোরান নিয়ে কথা বলাই মুশকিল হয়ে যায়। কোরানকে বর্জন করার সবচাইতে বড় প্রমাণ হল শুরুর দিকে কোরানের কোন দলিলের অস্তিত্ব না থাকা। জেরুজালেমের ডোম অব দ্য রকে কোরানের কিছু আয়াত সাজানো রয়েছে। এটিকে অনেকে প্রমাণ হিশেবে দাবী করে। কিন্তু আমরা জানি উক্ত আয়াতগুলো কোরানের বর্তমান পাঠের তুলনায় অনেকটাই আলাদা।[81]

কিন্তু একবার সানাই ম্যানুস্ক্রিপ্ট প্রকাশ করা হলে, ইসলাম আর ১,৪০০ বছরের পুরাতন ইসলাম থাকবে না। ইসলাম তখন একটি অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করবে। অনেক মুসলিমের মাঝ থেকে পবিত্র কোরানের রঙিন কল্পনা উবে যাবে। তাদের মাঝে প্রথম যে প্রশ্নটার উদয় হবে তা হল, কোন ভার্সনটা শ্রেয়? কিন্তু একটি কোরানকে গ্রহণ করে আরেকটি কোরান বাতিল করা সম্ভব না। কারণ মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি অংশ হল কোরানের একটি আয়াত অবিশ্বাস করার অর্থ সমস্ত কোরান অস্বীকার করা। এরই মধ্যে সানাইয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনেকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেক করেছে। কোরানকে মানহানির হাত থেকে বাঁচাতে ইয়েমেনি কর্তৃপক্ষ পুইন ও বোথমারকে সানাই পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা থেকে বঞ্চিত করেছে। ইয়েমেন সরকার এখন পুরনো ঐ পাণ্ডুলিপির কাছে কাউকে ভিড়তেও দেয় না। সেটি বর্তমানে দার আল মুখহাত লাইব্রেরীর গ্রাউন্ড ফ্লোরে সাজানো রয়েছে। কিন্তু এতে কোন কাজে হবে না। কারণ পাখি ইতোমধ্যে খাঁচা ছেড়ে উড়াল দিয়েছে। ৩৫,০০০ হাজার মাইক্রোফিল্মের আরও অনেক কপি তৈরি করা হয়েছে; সেগুলো নিয়ে জার্মানির গোপন একটি ফ্যাসিলিটিতে গবেষকরা রাত

---

[80] Warraq: 1998. p.17
[81] Warraq, 2000, p. 34

দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। পুইনও তার সমস্ত মেধা ও মধ্যরাতের মোমবাতি পুড়িয়ে নিজের বই লিখে যাচ্ছেন। বইটি প্রকাশিত হলে ইসলামের কফিনে আরেকটি পেরেক ঠোকা হয়ে যাবে।

ইরাকে জন্মগ্রহণ করা উনিশ শতকের ইতিহাসবিদ মিনাগা আফসোস করে বলেন, 'কোরান স্টাডিজের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এর অপরিবর্তনের দাবী।' এই একটি মাত্র কারণে কোরান নিয়ে অদ্যপি করা সমস্ত গবেষণা অপরিপক্ক থেকে গেছে। তাই হিস্টোরিক্যাল কোরানের সঙ্গে সঙ্গে যখন হিব্রু বাইবেল ও ক্রিশ্চিয়ানটির উপরে গবেষণা করা হয় তখন সবাই অবাক হয়ে লক্ষ করে, ইসলামের পরিচয় বহন করা এই বইটির সমালোচনা মূলক গবেষণার কত অভাব। 'ইসলামের জন্ম ইতিহাস দিনের আলোর মতো পরিষ্কার' এই ধারণা পুরোটাই ভ্রান্ত; ইসলামের ইতিহাসের এই রশ্মীর মাধ্যমে কোরান উৎপন্ন করেছে আরেক দল ভ্রান্ত মানুষদের, যারা বিভিন্ন কুযুক্তি দিয়ে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মতো ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে শক্তিশালী না। বাইবেল ও বেদের প্রাচীন ম্যানুস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে তাদের ধর্মের শিকড়ে পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু মক্কা মদিনা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়নি, ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। মুসলিমদের আত্ম সমালোচনার অভাব আলি সিনাও স্বীকার করে বলেছেন, 'মুসলিমরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সমালোচনা করতে অক্ষম।'[82]

***

---

[82] Sina, Ali (2008): Probing Islam

# কোরানের পাঠগত ইতিহাস

মানব ইতিহাসে যখনই কোন ধর্মীয় লিপি খুঁজে পাওয়া গেছে, গবেষকদের সবার প্রথমে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল ইনস্ক্রিপশনের টেক্সটের সঙ্গে বর্তমান টেক্সটের পার্থক্য। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম না। উদাহরণ হিশেবে বৌদ্ধ ধর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, পালি শাস্ত্র, সংস্কৃতি শাস্ত্র, তিব্বত শাস্ত্র, চীনা শাস্ত্র। জরইস্ত্রিয়ানিজমের ক্ষেত্রে আমরা ইরানি স্কলারদের মাঝে আভেস্তান টেক্সট নিয়ে জলজ্যান্ত বিতর্ক দেখতে পাই। একইভাবে ইরানের প্রাচীন ভাষা পাহলভির গ্রন্থগুলোতে আরও বেশী জটিল সমস্যা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। গত একশো বছরের ইতিহাসে প্রতিটি প্রজন্মের ছাত্ররা বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের নতুন নতুন পাঠগত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। চেস্টার বেটির পাপাইরাই এবং রেনল্ডের গসপেল ফ্রাগমেন্ট নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল তা এখনও আমাদের মনে আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ মিশরীয় ‘বুক অব ডেড’ থেকে শুরু করে সর্ব কনিষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থ আরবের ‘আল কোরান’ সবকটিতে পাঠগত সমস্যার ইতিহাস রয়েছে।

নন রিলিজিয়ন পাণ্ডুলিপিগুলোতে আমরা মূল লেখকের স্বহস্তে লিখিত বাণীগুলো পাই, কিন্তু ধর্মীয় পাণ্ডুলিপিতে তা এখন অবধি পাওয়া যায়নি। আমাদের কাছে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র রয়েছে যেখানে খুব সামান্য কিছু হস্তান্তর জনিত সমস্যা রয়েছে। অনেক সময় এক হাত থেকে আরেক হাতে পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় কিছু ইচ্ছাকৃত ভুল বা পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু সেগুলো অসৎ উদ্দেশ্যে না; বরং খুব সৎ উদ্দেশ্যে নিয়েই করা হয়; তবুও এটা ভুল। উদাহরণ হিশেবে বলা যায়,

আভেস্তা লেখা হয়েছিল সাসানিয় পাহলভির নতুন বর্ণমালায় সাসানিয় সময়কালে, তাই আদি সাসানিয় আভাস্তান বর্ণমালা দেখতে কেমন ছিল এ ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণা নেই। একই ভাবে আমরা জানি হিব্রু স্ক্রিপচার 'চৌকোনা বর্ণমালায়' লেখা হয় কিন্তু আদি হিব্রু বর্ণমালা হুবহু এরকম দেখতে ছিল না। এছাড়াও আদি হিব্রু বাইবেলের সমস্ত কপিতে 'নোক্তা' কিংবা ডায়াক্রিটিকাল মার্কের ব্যবহারে সঙ্গে নতুন ছাপানো টেক্সটগুলোতে তিন ধরণের 'নোক্তার' ভিন্নতা দেখা গেছে। কিন্তু কোরানের কাছে গেলে আমরা পাই, কোরানের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে একেবারেই নোক্তা বা স্বরবর্ণের চিহ্নের ব্যবহার ছিল না এবং প্রাচীন কুফিক স্ক্রিপ্ট বর্তমান স্ক্রিপ্টের থেকে ভীষণ আলাদা। এতটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোরানের স্ক্রিপ্টের আধুনিকীকরণ এবং স্বরবর্ণের চিহ্নের ব্যবহার বা নোক্তা যুক্ত করা, বানান শুদ্ধিকরণ শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে। Textus receptus বা বাইবেলের পাঠের পরিবর্তন আমরা প্রতিটি কপিতেই দেখি। এর ফলে নোক্তা ব্যবহার করে হরফ ও বানানে পরিবর্তন ঘটালেও এর অর্থ অপরিবর্তিত থেকে যায়। কিন্তু অবিকল প্রতিলিপি কোরানের বেলায় অনুপস্থিত, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় টেক্সট পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। এই পাঠগত পরিবর্তনের ইতিহাস আমরা সাধারণ মানুষ কতটা জানি?

অবশ্যই পাঠগত পরিবর্তনের একটি ধর্মীয় তত্ত্ব রয়েছে। ভারতে বসবাসরত পার্সিয়ানদের যেমন আভেস্তাকে নিয়ে ধর্মীয় তত্ত্ব রয়েছে, ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঠগত পরিবর্তন নিয়ে তেমন রাব্বিনিক লিটারেচার তত্ত্ব রয়েছে; যদিও স্কলাররা কোন ধর্মীয় তত্ত্ব মানেন না কিন্তু তারা একই ধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থিত ধর্মীয় পুস্তকগুলোর পাঠগত পরিবর্তন কে বেশ গুরুত্ব দেন। সেদিক থেকে গোঁড়া মুসলিমদের তত্ত্ব একেবারে সাদাসিধে।

পৃথিবী সৃষ্টির আগে আল্লাহ কলম ও কাগজ সৃষ্টি করেন, এবং তার হুকুমে কলম কাগজের উপরে আল্লাহর বানী লেখে। সেই বানীগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি নবীর কাছে জিবরাইলের মাধ্যমে প্রদান করেন। নবী মুহাম্মদের আগমনের পর তার

উপর ওহী নাযিল শুরু হয়, তার কাছেও জিবরাইল ফেরেশতা আসতে থাকেন। ধীরে ধীরে প্রায় ২২ বছর যাবত আল্লাহর বাণী মুহাম্মদের উপরে নাযিল হয়। প্রতি বছর জিবরাইল আল্লাহর বাণীগুলো নবী মুহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেখতেন সব আয়াতগুলো হুবহু আছে কিনা। ওহী নাযিলের শেষ বছরে জিবরাইল ও মুহাম্মদ একে অপরের আয়াতগুলো দুই বার মিলিয়ে নেন। মুহাম্মদের সঙ্গে জিবরাইল আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত আয়াত মিলিয়ে নেয়া সেই আয়াতগুলো চতুর্থ আসমান লাওহে মাহফুজেও সংরক্ষিত আছে, এবং নবী মুহাম্মদের আয়াতগুলো তার সাহাবীরা বিভিন্ন স্থানে লিখে রাখেন। নবী বেঁচে থাকতেই আয়াতগুলো শ্রুতি লেখকদের দ্বারা অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়ে নিতেন। নবীর মৃত্যুর পর তার সাহাবীরা যখন অনুধাবন করেন যে তাদের কোরান সংকলিত করে রাখা প্রয়োজন, ততদিনে কোরানের বড় একটি অংশ হারিয়ে যায়, এবং যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা কিছু মৌখিক প্রথার মাধ্যমে ভাসমান আয়াত এবং হাড়-গোড়, চামড়া ও গাছের বাঁকলের সমাহার ছাড়া কিছুই না।

কোরান সংকলনের ইতিহাস ইতোমধ্যে আমরা দুইবার বর্ণনা করেছি। কোরান সংকলনের প্রথম স্টেজে কোরানের যে পাঠ সর্বজনীনভাবে বাছাই করে নেয়া হয়েছিল নিশ্চিত ভাবেই তা মুহাম্মদের পছন্দকৃত স্ট্যান্ডার্ড পাঠ না। তিনি ইবনে মাসুদের পাঠ অনুসরণ করতে বলেন কিন্তু উসমান কোরান সংকলন করেন কুরাইশদের পাঠে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ ছিলেন তামিম গোত্রের। নিঃসন্দেহে তার আরবি ভাষায় তামিম গোত্রের ভাষা রীতির আধিক্য বেশী থাকবে।

কোরান সংকলনের পর নতুন সমস্যার উদয় হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়া আয়াতগুলোকে বোঝার জন্য পাঠককে অবশ্যই অর্থ ব্যাখ্যা করে দিতে হতো। পাঠককেই সিদ্ধান্ত নিতে হতো নোক্তা ছাড়া হরফটি শিন নাকি সিন, সদ নাকি দত, ফা নাকি কাফ হবে। ব্যঞ্জন বর্ণের ঝামেলা মেটানোর পর পাঠককেই ঠিক করতে হতো বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াটি সকর্মক নাকি অকর্মক অথবা সেটাকে ক্রিয়া বাচক শব্দ হিশেবে ব্যবহার করবে নাকি নাম বাচক শব্দ হিশেবে ব্যবহার করবে। প্রথম প্রজন্মের ক্বারিদের কাছে এই সমস্যা কোন গুরুত্বর সমস্যা ছিল না। থিয়োরিটিকালি,

মুখস্থ প্রথার ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ যুক্ত চিহ্নের ব্যবহার পাঠকেরা স্মৃতিতে গেঁথে রাখতো, ঠিক যেমনটা প্রাচীন কবিতাগুলো মুখে মুখে প্রচার করার জন্য মনে রাখার হতো তেমন ভাবে। কিন্তু আদতে প্রচুর সংখ্যক ভিন্ন পাঠ প্রমাণ করে যে এর সঙ্গে পাঠ পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই। উসমানের অফিশিয়াল টেক্সট প্রকাশ পর থেকে ৩২২ হিজরি পর্যন্ত কোরান ছিল 'ইখতিয়ার' যুগে। 'ইখতিয়ার' শব্দের অর্থ 'স্বেচ্ছায়' (Free will)। আশ্চর্যের বিষয় হল ইখতিয়ার যুগের শেষ পর্যন্তও অনেক মহা পণ্ডিতদের কাছে উসমানের টেক্সটের পাশাপাশি পুরাতন অ-উসমানিক হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপির কোরান ছিল। তারা উসমানের টেক্সট ছাড়াও অন্য সাহাবিদের স্টাইলে কোরান তেলাওয়াত করতেন। আমরা জানি যে ইখতিয়ারের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক তাদের শিক্ষাকে ছাত্রদের মাঝে চিরস্থায়ীভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোকে চিহ্নিত করে অ-ক্রিয়াবাচক ( العربية ) শব্দগুলোকে যেন মুছে ফেলা হয়। এর ফলে কোরানের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একটি কেন্দ্র সভায় একত্রিত হয়। সেই সভার পর থেকেই আমরা ক্রিয়া বাচক শব্দ চিহ্নিত করার কুফা ট্র্যাডিশন, বসরা ট্র্যাডিশন ও সিরিয়ান ট্র্যাডিশনের নাম শুনে আসছি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের কোরান শিক্ষার ইমামেরা তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে কোরান শিক্ষার প্রচলনে গুরুত্ব দেন। নিরপেক্ষ বিবেচনায় তিনটি তত্ত্বের নাম পাওয়া যায় যেগুলো ইখতিয়ারের অগ্রদূত ছিল- যেমন: মুশাফ আরাবিয়া, ইসনাদ। ইসনাদ ও মুশাফ আরাবিয়ার মাধ্যমে গ্রন্থ পাঠের ধ্বনিকে ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা আরবি ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। এই নিয়ম নিয়ে সে সময় প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিছু গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলিমরা দাবী করে আরবি ভালো করে বুঝে পড়ার সঙ্গে উসমানের কোরান এবং তার পূর্ববর্তী প্রাচীন কোরানের কোন সম্পর্ক নেই, যেহেতু দুটোই নবীর সময় কালে নাযিল করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, উসমান যদি কোরান সংকলন করে বাকী কোরানগুলোকে ধ্বংস করেই থাকবে, তবে ইখতিয়ারের মাধ্যমে কোরানের বিভিন্ন পাঠ তখনও কেন দেখা যাবে? সেগুলোতো উসমানের সংকলনের মাধ্যমেই শেষ হয়ে

যাওয়ার কথা ছিল। এর সম্ভব্য উত্তর হলো, উসমানের কোরান কখনো সংকলন করা হয় নি। যাই হোক, কিছু মুসলিম ইসনাদকে অবজ্ঞা করত; তবুও ইসনাদের মাধ্যমে আরবি রচনাশৈলী সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

প্রাচীন কোরানের টেক্সটে কোন প্রতীক ছিল না, তাই পাঠককে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হত এবং ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত টেক্সটগুলো তার স্মৃতির উপরে ভর করেই পাঠ করতে হত। পাঠক কোরান দেখে তেলাওয়াত করলেও তার স্মৃতিশক্তি প্রয়োগের সর্বচ্চ ক্ষমতার উপরে কোরান পাঠের নির্ভুলতা নির্ভর করত। স্মৃতি বড় বিশ্বাসঘাতক জিনিস, এবং কোরানকে খুব দ্রুত এর মুখোমুখি হতে হয়। সে সময় খ্রিস্টানরা সিরিয়ান বাইবেলগুলোতে কালো ও রঙিন বিভিন্ন ধরণের নোক্তা, তাশখিল পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠের অনুশীলন করত। মুসলিমদের হাদিস পুরোপুরি নোক্তা পদ্ধতি ও তাশখিল পদ্ধতি ব্যাবহারের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, কেননা নোক্তার আবিষ্কার প্রচলিত ধর্ম প্রথায় ব্যাবহারের বিরুদ্ধে। কে প্রথম কোরানে চিহ্ন প্রথা ব্যবহার করেন এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ঐকমত নেই। তবে ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার এবং নাসের বিন আসিমের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। চিহ্ন ব্যাবহারের প্রাথমিক সময়ে এ নিয়ে বেশ অস্থিরতা বজায় ছিল। আমাদের হাতে বিভিন্ন ধরণের হরফের জন্য একেক রঙে ব্যবহৃত নোক্তা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যেখানে বর্তমান কোরানের তুলনায় বেশিরভাগ হরফে নোক্তা ব্যবহার করা হয়নি। এর অর্থ হল প্রথম দিকে যে হরফগুলোতে নোক্তা ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোর সঠিক উচ্চারণ ও ব্যবহার নিয়ে পাঠকদের মাঝে বেশী অনিশ্চয়তা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। চিহ্ন প্রথার অনুশীলন সরকারীভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে আল-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক। তিনি খলিফা আব্দুল মালেকের সময়কালে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। কোরানে নোক্তা নিয়ে যখন আমরা হাজ্জাজের প্রভাব পরীক্ষা করতে যাই, আমরা লক্ষ্য করি তার উদ্দেশ্য শুধু কোরান কীভাবে পাঠ করা হবে তা ছিল না বরং তিনি আস্ত কোরানকেই সংশোধন করেন। হস্ত লিখিত কোরানের বেশিরভাগ উন্নতি ঘটানো হয়েছিল খলিফা মালেকের শাসনামলে। তার সময়ের একজন আলেম আবুল আসওয়াদ আদদুইলি

প্রথম আরবি ব্যকরণের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনিই প্রথম কোরানের হরফের উপরে নোক্তা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই পরামর্শ কার্যকর করেন[83] এবং কোরানকে প্রথমবারের মতো এক খণ্ডে বাঁধাইয়ের মাধ্যমে বিশাল আকৃতি দান করে গ্রন্থের আকার দিয়ে মূল পাণ্ডুলিপিগুলো আরব বিশ্বের বিখ্যাত মহানগরগুলোতে প্রেরণ করেন, ও পুরাতন সমস্ত পাণ্ডুলিপিকে ধ্বংস করে দেয়ার ফরমান জারি করেন। আল হাজ্জাজের দ্বারা ঘোষিত নতুন টেক্সটের ঘোষণার ফলে কম বেশী সব স্থানেই পরিবর্তন করা হয়। খ্রিষ্টান লেখক আল কিন্দি তার সমালোচনা মূলক গ্রন্থ Apology of al-Kindi-তে আল হাজ্জাজের কোরান পরিবর্তনকে বিতর্কিত দাবী করেন। সবাই জানে, তিনি কোরানের টেক্সট তৈরি করেছিলেন কিন্তু সেটি স্কলারদের দ্বারা নিরীক্ষিত ছিল না। এখানে অতিরঞ্জন ও পক্ষপাত মূলক আচরণ করা হয়েছে। শুধু মাত্র নোক্তা সংযুক্তির জন্য সমস্ত পৃথিবীর কোরানকে নষ্ট করে ফেলা যে হয়নি তা হাদিসে উল্লেখিত কোরান হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা, আয়াত বাদ দেয়ার বর্ণনা, এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর সঙ্গে বর্তমানের কোরানের পার্থক্যই প্রমাণ করে কোরানের বিষদ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। পাক্ষপাতমূলক একটি অতিরঞ্জিত গ্রন্থ হল ইবনে আবু দাউদের কিতাব আল মাশিফ। উক্ত গ্রন্থে আবু দাউদ আল হাজ্জাজের কোরানের পরিবর্তিত টেক্সটগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তথ্য প্রমাণ বলছে, কোরানের মূল textus receptus খলিফা উসমান  না, বরং সেটি আল হাজ্জাজ করেছেন।

ইখতিয়ারের সমাপন ঘটে ৩২২ হিজরি সনে যখন ওয়াজির ইবনে মুকলাহ এবং ইবনে ঈসা, মহা পণ্ডিত আবু বকর ইবনে মুজাহিদের দ্বারা পরিচালিত কোরানের টেক্সটে সাতটি রীতিতে (Seven Systems/ সাত আহরূফ) নিবদ্ধ করে ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত বলে প্রজ্ঞাপন জারি করেন। তাদের এই সিদ্ধান্ত যে বিনা বাঁধায় গৃহীত হয়েছিল তা কিন্তু না। বরং তাদের বিরোধিতা করে ইখতিয়ারের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করলে দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে মিকসাম

[83] Oliver Leanab 2006: Manuscript and the Quran

ও ইবনে সাবুধকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়। এই দুজন অনুধাবন করতে পারে সেভেন সিস্টেমের গ্রামার যদি কোরানের পাঠের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তবে ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছায় পাঠের যুগ শেষ হয়ে যাবে। সেভেন সিস্টেমগুলো হল ইবনে মুজাহিদ, মদিনা স্কুলের নাফি, মক্কা স্কুলের কাছির, সিরিয়ান স্কুলের ইবনে আমির, বসরা স্কুলের আবু আমর, এবং কুফা স্কুলের আসিম, হামজা ও আবু আল হাসান ওরফে আল কিসাই। কুফা স্কুলের কয়েকজন প্রথম থেকেই এ নিয়ে তীব্র বিবাদ করে আসছিলেন। তাদের একজন আরেকজনকে বদলি করে কেউ মদিনার আবু জাফরের দলে অবস্থান নেন, আবার কেউ বসরার ইয়াকুবের পক্ষ নেন। ফলে বিবাদ আরও জোরাল হয়। কুফা স্কুলের খালাফ বা প্রার্থীগণ নিপীড়নের শিকার হন। ইবনে মুজাহিদ সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিলেন যাই ঘটুক না কেন সেভেন সিস্টেমকে ধর্মীয় বৈধতা দিয়ে ছাড়বেন। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেমন ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত হিব্রু বাইবেলের টেক্সট চেনার পদ্ধতি মেসোরাহকে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছিল, তেমনই ঘটনা ঘটে কোরানের বেলায়; বরং এ ক্ষেত্রে ইসলাম আরও সহিংস অবস্থান নেয়। যাই হোক এই বিবাদের জের ধরে মোটমাট ১৪ আহরূফ (Fourteen Systems) উত্থাপিত হয়। যার ভেতরে দশটি স্বাভাবিক পাঠ নীতি এবং চারজনের আলাদা পাঠকে নির্ধারিত হয়, যেমন মক্কার ইবনে মুহাসিন, বসরার আল হাসান, বসরার আল ইয়াজিদ এবং কুফার আল আমাশ। ইনাদের পদ্ধতি ইবনে মুজাহিদের সেভেন সিস্টেমের তুলনায় অধিকতর ভালো ছিল কিন্তু তবুও সেগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। কেন সেগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এর সঠিক ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না। আল মুজাহিদ সেভেন সিস্টেমের সমর্থন পেয়ে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর ভেতরে তার পদ্ধতিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন।

সেভেন সিস্টেমের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রদত্ত একটি সিস্টেমেরও আকার আমাদের কাছে নেই। উক্ত সেভেন সিস্টেম স্কুলগুলোতে প্রেরণ করা হয়, এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তা ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং রেওয়াজের (তেলাওয়াতের নিয়ম) মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কোরানের টেক্সট কীভাবে পাঠ করা হবে। অবশ্য দু

একটি পাঠ নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। আদ-দানির (মৃত্যু ৪৪৪ হিজরি) সময়ের মধ্যে পাঠগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। তিনি তার তাফসিরে লিখেছেন, সেভেন সিস্টেমে প্রত্যেকটির জন্য দুটো করে রেওয়াজ ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা এবং মঞ্জুরি পায়। কীভাবে ওগুলো বাছাই করা হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই, এমনকি এটা অনুমানও করা সম্ভব না। আমাদের শুধু এতটুকু জানানো হয়েছে যে এই সংযুক্তির ফলে কোরানের অর্থ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। নাফির জন্য কালুন ও ওয়ারশ রেওয়াজ; ইবনে কাছিরের জন্য কানবাল এবং বাজি রেওয়াজ; ইবনে আমিরের জন্য দাকওয়ান ও হিশাম রেওয়াজ, আবু আমরের জন্য আদ-দুরি ও আস-সুসি রেওয়াজ; হামজার জন্য খালাফ ও খাল্লাদ রেওয়াজ; আসিমের জন্য হাফস ও আবু বকর রেওয়াজ; আল কিসাইয়ের জন্য আদ-দুরি এবং আব্দুল হারিছ রেওয়াজ বেছে নেয়া হয়। এই সবগুলো রেওয়াজের তেলাওয়াতই ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত। তবে মনে রাখতে হবে, কোন নির্দিষ্ট রেওয়াজ আলাদাভাবে সরকারী অনুমোদন যোগ্য ছিল না। তাই 'ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য' শব্দটি এখানে একশত ভাগ শুদ্ধ না। কিন্তু এই রেওয়াজসমূহ সেরা পণ্ডিতদের কর্তৃক অনুমোদিত। এর ফলে আদি কোরানের কোডিয়াকসের বিলুপ্তি ঘটে। সেকারণেই এটিকে শতভাগ ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য বলা সম্ভব না। এটি যেমন ধর্মর নীতিতে গ্রহণ করা সম্ভব না তেমন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ফেলেও দেয়া সম্ভব না।

এই পদ্ধতিটি ছিল কোরান পাঠকে সহজ করার জন্য; শুধু শুধু কোরানের মাঝে চিহ্ন যুক্ত করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য না। কিন্তু আয়াতের শেষে ব্যবহৃত চিহ্নগুলো প্রতিটি পুরাতন কোডিয়াকসেই দেখা যায়। এর মানে এই নয় যে সকল পণ্ডিতই বিরাম চিহ্নের প্রতি সম্মতি জানিয়েছিলেন, তবুও বিরাম চিহ্ন কোরানে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে কোন প্রকার ধর্মীয় বিধি নিষেধ ছাড়াই সুরাগুলোকে চিহ্নিত করণের প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু প্রতিটি সুরার প্রথমে নাম যুক্ত করার প্রথা চালু হয় অনেক পরে। এলাকা ভেদে সুরার আলাদা নামও ব্যবহার করা হয়েছে, এমনকি বর্তমান সময়ে এসেও উপরিভাগে

সুরার নাম যুক্ত করার পরিপূর্ণ কোন সম্মতি পাওয়া যায় না, কেননা লিথোগ্রাফের মাধ্যমে নাম যুক্ত করার পদ্ধতি প্রতিটা শতাব্দীতেই পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন নামে দেখা গেছে। সুরা ও আয়াত ছাড়াও কোরানের অন্য অংশগুলোকে চিহ্নিত করার প্রথা আছে। কিছু লিপিকারেরা প্রতি দশটি টেক্সটকে একত্রিত করে একটি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছেন; আবার কিছু লিপিকার সাতটি টেক্সটকে একত্রিত করে একটি গ্রুপ বানিয়ে অষ্টম টেক্সটের বেলায় বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছেন; কেউ আবার শুরু এবং শেষে চারটি কিংবা মধ্য অংশ যোগ করে আটটি চিহ্ন ব্যবহার করেন; ইত্যাদি। কিন্তু টেক্সট ভাগ করার সবচাইতে জনপ্রিয় রীতি হল পুরো কোরানকে ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত করা; যেন ত্রিশ দিনে কোরান তেলাওয়াত শেষ করা যায়। যেহেতু এই বিভাজন দুই ও চারভাগেও করা যায় সেহেতু ত্রিশ ভাগে ভাগ করতে গিয়ে লিপিকারদের একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সুরা ও আয়াতের বদলে যুজ (পারা) ও আহজাবের (Ahzab) মাধ্যমেই পূর্বের বেশিরভাগ গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গ কোরানের উদ্ধৃত করতেন।

কোরানের টেক্সটুয়াল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন মহান পণ্ডিতের দুর্বোধ্য কিন্তু প্রামাণ্য নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে নাকি দুর্বল অথচ সহজ নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে তা বিবেচনা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বোধ্য নমুনাগুলো মানের দিক থেকে উন্নত হলেও কাঠিন্যতার কারণে অনেক সময় তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের শিক্ষার্থীরা হিব্রু বাইবেলের পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত টেক্সটগুলোকে প্রামাণিক নমুনা হিশেবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ বাইবেলের নতুন সংস্করণ এলে হিব্রু বাইবেলকে স্ট্যান্ডার্ড রেখে বাইবেল প্রকাশ করা হবে। একই বিষয় কোরানের ক্ষেত্রেও খাটে। আদ-দানির সময়কালে মুকনি ও তাইসিরকে প্রামাণিক নমুনা হিশেবে বেঁছে নেয়া হয়েছিল। এগুলো ছিল কোরানের লেখকদের জন্য নিয়মাবলীর গ্রন্থ। আদ-দানি লেখকদের জন্য অবশ্যই পালনীয় কিছু নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দেন। তাই সমস্ত অদ্ভুত বানান ও অস্বাভাবিক বানান পদ্ধতি থাকার পরও সেগুলো অবশ্যই তাদের পাণ্ডুলিপিতে যুক্ত করতে হতো। এমনকি তারা জানতো যে এগুলো ভুল তবুও

তারা সেগুলো কোরান থেকে সংশোধন করেননি। যেমন, رحمت -কে অবশ্যই ت সহ লিখে শেষ করতে হতো, এবং এর সঠিক বানান رحمة ব্যবহার করা হতো না; XVIII, 36 আয়াতে لكنا শব্দটির শেষে ব্যবহৃত সঠিক শব্দ لكن এর পরিবর্তে লম্বা ا দ্বারা লিখতে হতো; XX,95 আয়াতে يبنؤم -কে يا ابن أم এর পরিবর্তে লিখা হতো; XVIII,47 আয়াতে مال هذا এর সঠিক বানান ما لهذا ব্যবহার করা যেত না; XXXVII,130 আয়াতের ال ياسين শব্দটির সঠিক বানান الياسين হলেও তা ভুলই লিখা হতো, ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রামাণিক নমুনা ব্যবহার করার সময় এই ভুলগুলো কোরানে কীভাবে থেকে গিয়েছিল? এর কোন সদুত্তর আমাদের জানা নেই। অর্থোডক্স থিয়োরি অনুযায়ী, এই অস্বাভাবিক বানান বা ভুল বানানগুলো প্রথম থেকেই উসমানের কোরানে ছিল। অথচ অদ্ভুত হলেও সত্য, এই অস্বাভাবিক বানানগুলো প্রাচীন কুফিক স্ক্রিপ্টের পাণ্ডুলিপির ফ্রাগমেন্টগুলোতে পুরোপুরি অনুপস্থিত। মুসলিমদের দাবী অনুযায়ী এই ভুল বানানগুলো উসমানের কোরানে বিশেষজ্ঞদের হাতে থাকা কোরানের পাণ্ডুলিপিতেও ভুল বানান থাকার কথা।

সেভেন সিস্টেমে উল্লেখিত সবগুলোই ধর্মীয় বিধি সম্মত, এবং গ্রহণযোগ্য রেওয়াজ অনুযায়ী তেলাওয়াত করা হয়। কোন লিখিত টেক্সট না থেকেও সাতটি ভিন্ন টেক্সটকে প্রকাশ করা সম্ভব। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি কুফিক পাণ্ডুলিপির ফ্রাগমেন্ট রয়েছে যেখানে ভিন্ন রঙের নোক্তা, ভিন্ন পাঠ, এবং কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন হরফ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু পাণ্ডুলিপিতে নিচে ব্যবহৃত পাদটীকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে দশের মাঝে সাতটি রেওয়াজের তেলাওয়াতে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

মাত্র এক প্রজন্ম পূর্বে, সুদান বসরার আদ-দুরি রেওয়াজের কোরান, উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলি থেকে মরক্কো পর্যন্ত প্রচলিত ধারার ম্যানুস্ক্রিপ্ট পাওয়া যেত; এবং অনেক লিথোগ্রাফট এডিশনে মদিনার ওয়ারশ রেওয়াজ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তখন

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র কুফার 'আসুন' রেওয়াজের হাফস এডিশনের কোরান প্রচলিত ছিল। এর পরের বছরগুলোতে হাফস টেক্সটের কোরান সুদানের আদ-দুরি কোরানকে সরিয়ে স্থান দখল করে নেয়; এবং এর থেকেও দ্রুত গতিতে উত্তর আফ্রিকার ওয়ারশ কোরানকে সরিয়ে হাফস কোরান স্থান দখল করে নেয়। আধুনিক যুগেই একটি দেশে এত বড় একটি পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলা হলো সবার চোখের সামনে তাহলে ভেবে দেখুন ১০০০ বছর আগে বিষয়টি কতটা প্রকট ছিল। কোরানের পাঠগত ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে সব ধরনের ইসলামের জন্য textus receptus হলো হাফস এডিশনের কোরান। এটি মিশরীয় স্ট্যান্ডার্ড এডিশন ১৩৪৪ হিজরির আদলে তৈরি করা। মিশরীয় স্ট্যান্ডার্ড এডিশনের মাধ্যমে কোরানের বানানকে আধুনিকরণ করা হয়েছে, অতিরিক্ত মেসোরিয় নোক্তা ও চিহ্ন সংযুক্ত করা হয়েছে। তবুও মুসলিমরা একেবারে নির্ভেজাল হাফস টেক্সট তৈরি করতে পারেনি। তবে এটি অন্য কোরানগুলোর থেকে সর্ব উৎকৃষ্ট। ১৮৬৪ সালের প্রথম প্রকাশের পর থেকে এটি একচেটিয়া ভাবে ইউরোপের পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

[১৩ অক্টোবর, ১৯৪৬ সালে মিডল ইস্ট সোসাইটি অব জেরুজালেমের সভায় অনুষ্ঠিত,
আর্থার জেফ্রির লেকচারের সংক্ষিপ্ত রূপ।]

## কোরানের বিভিন্ন সংস্করণ

কোরান নিয়ে মুসলিমদের সব চাইতে জনপ্রিয় দাবী হলো এটি নাযিলের পর থেকে বিন্দু মাত্র পরিবর্তিত হয়নি। মুসলিমরা এটি শুধু মুখেই বলে না, মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে। এটি মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসেরই একটি অংশ। এই দাবীর উপরে ভিত্তি করে বলা যায়, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যতগুলো কোরান আছে তার তার কোনটিতেই ভিন্নতা থাকার কথা না। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা কোরানের পাঠগত পরিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, বর্তমানে বিভিন্ন কোরানের মাঝে কী কী ভিন্নতা রয়েছে।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে কোরানের চিহ্নের অভাবে, এবং স্মৃতিতে ধারণ করার কাঠিন্যতার জন্য ইসলামের মহাপণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের পাঠ নির্ধারণ করা হয় হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে। এর ফলে সাতজন প্রামাণিক ব্যক্তির পদ্ধতিতে কোরান তেলোয়াত করা হয়। প্রত্যেকের দুটো করে কোরান তেলোয়াত পদ্ধতি রয়েছে। ফলে মোট চৌদ্দ ভাবে কোরান তেলোয়াত করা সম্ভব। প্রামাণিক ব্যক্তিরা হলেন, মদিনার নাফি (৭৮৫), মক্কার ইবনে কাছির (৭৩৭), দামেস্কোর আবু আমর আল-আলা (৭৭০), বসরার ইবনে আমির (৭৩৬), কুফার হামজাহ (৭৭২), কুফার আল কিসাই (৮০৪), কুফার আবু বকর আসিম (৭৭৮)।[84]

আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, কোরান তেলোওয়াতকারীদের মাধ্যমে হাত বদল হয়েছে। অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে গেছে। কোরানের প্রথম দুই শতকের মাঝে তারা ছিলেন বিখ্যাত তেলোওয়াত কারী। তেলোওয়াত কারীরা যেভাবে তেলোয়াত করতেন ঠিক তাদের তেলোওয়াত অনুযায়ী যারা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাদের ‘প্রেরক’ বা ট্রান্সমিটার বলে। প্রেরক, তেলোওয়াতকারী এবং তাদের অধ্যুষিত এলাকার একটি তালিকা নিচে তুলে ধরা হল:

| **কিরাত** | **কারী/প্রেরক** | **বর্তমানে ব্যবহৃত এলাকা** |
|---|---|---|
| | **"সাত আহরুফ"** | |
| নাফি | ওয়ারশ | আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনেশিয়ার কিছু অংশ, পশ্চিম আফ্রিকা ও সুদান |
| | কালুন | লিবিয়া, তিউনেশিয়ার কিছু অংশ, এবং কাতারের কিছু অংশ |

[84] The Concise Encyclopedia of Islam, p. 324

<table>
<tr><td rowspan="2">ইবনে কাসির</td><td>আল বাজি</td><td></td></tr>
<tr><td>কানবাল</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">আবু আমর আল আলা</td><td>আল-দুরি</td><td>সুদান ও পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশ</td></tr>
<tr><td>আল সুরি</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">ইবনে আমর</td><td>হিশাম</td><td rowspan="2">ইয়েমেনের কিছু অংশ</td></tr>
<tr><td>ইবনে দাকওয়ান</td></tr>
<tr><td rowspan="2">হামজাহ</td><td>খালাফ</td><td></td></tr>
<tr><td>খাল্লাদ</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">আল কিসাই</td><td>আল দুরি</td><td></td></tr>
<tr><td>আব্দুল হারিছ</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">আবু বকর আসিম</td><td>হাফস</td><td>পুরো মুসলিম বিশ্ব</td></tr>
<tr><td>ইবনে আয়াশ</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">"তিন আহরুফ"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">আবু জাফার</td><td>ইবনে ওয়ারদান</td><td></td></tr>
<tr><td>ইবনে জামাজ</td><td></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| ইয়াকুব আল হাশিমি | রুওয়াইয়াস | |
| | রাওয়াহ | |
| খালাফ আল বাজ্জার | ইসহাক | |
| | ইদ্রিস আল হাদ্দাদ | |
| Abu Ammaar Yasir Qadhi, *An Introduction to the Sciences of the Qur'aan*, p. 199. | | |

উপরের তালিকাটি থেকে প্রমাণিত হয় কোরান বিভিন্ন ভার্সনে প্রথম থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। এই ভার্সনগুলোর বাহিরে কোন কোরান তেলোওয়াত করা যাবে না। প্রতিটা ভার্সনের হাদিসের মতো একজন নির্দিষ্ট ইসনাদ (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) রয়েছে। তালিকার বাহিরে আরও অনেক কোরান রয়েছে যেগুলোর ইসনাদ অনেক দুর্বল। এর মাঝে সবগুলো ভার্সন বর্তমানে ছাপানো হয় না, এবং ব্যাবহার হয় না।

এতবড় একটি তালিকা থেকে যে কঠিন সত্যটি বেড়িয়ে আসে তা হল কোরানের পাঠ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি এখনও থেকে গেছে। বিষয়টি আরও ভালো করে বোঝার জন্য আমরা দুটো কোরানকে তুলনা করবো। বাম দিকের কোরানটি মুসলিম বিশ্বে সব চাইতে ব্যবহৃত কোরান। মিশরীয় স্ট্যান্ডার্ড এডিশনের ইমাম হাফসের প্রেরিত ভার্সন। ডানদিকের কোরানটি ইমাম ওয়ারশের প্রেরিত ভার্সন যা মূলত উত্তর আফ্রিকায় ব্যবহৃত হতো।

আমরা যখন এই দুটি কোরানের তুলনা করেছি তখন জেনেছি এগুলো অভিন্ন নয়। এগুলোর মাঝে চার ধরণের পার্থক্য রয়েছে।

- রৈখিক/মূল হরফের পার্থক্য
- বৈশিষ্টসূচক পার্থক্য
- স্বরবর্ণের পার্থক্য
- বাসমালা'র পার্থক্য
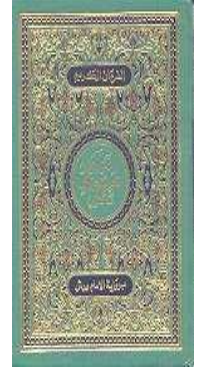
নিচের তালিকায় দুটো কোরানের একই আয়াত থেকে তুলে দেয়া হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কোরানের আয়াত নাম্বার আলাদা কেননা দুটো কোরানের স্ক্রিপ্টে পার্থক্য রয়েছে: ওয়ারশ ভার্সনের কাফ হরফটিতে উপরে মাত্র একটি নোক্তা, এবং ফা'য়ের নিচে একটি নোক্তা রয়েছে। এটি উত্তর আফ্রিকার (মাঘরিবি) আরবি বানান রীতি।

## রৈখিক ও মূল হরফের পার্থক্য

| ইমাম হাফসের কোরান | ইমাম ওয়ারশের কোরান |
|---|---|
| وَوَصَّىٰ<br>অঅছছোয়া<br>আর ইব্রাহীম তার ছেলের সঙ্গে অসিয়ত করেছেন... ২:১৩২ | وَأَوْصَىٰ<br>অয়া'আওসা<br>এবং ইব্রাহীম তার ছেলেকে উপদেশ দিলেন ... 2:131 |

| | |
|---|---|
| অয়াসারি’উউ<br><br>এবং দ্রুত চলো ... ৩: ১৩৩ |  সারি’উউ<br><br>দ্রুত চলো... ৩:১৩৩ |
|  ইয়ারতাদ্দা<br><br>...পশ্চাৎপদ ... ৫: ৫৪ | ইয়ারতাদিদ<br><br>... পশ্চাৎপদ... ৫: ৫৬ |

কোরানের এই দুটি আলাদা শব্দের একই অর্থ করা হয়েছে। 8’th ফর্মের জেসিভ ভার্ব বা আদেশ বাচক ক্রিয়ার দুই ধরণের উদাহরণ রয়েছে। ডায়ালেক্ট অনুযায়ী এর অর্থে পার্থক্য থাকার কথা।

| | |
|---|---|
|  ক্বালা<br>তিনি বললেন (ক্বালা), "আমার মাবূদ জানেন..." (২১:৪) |  কুল<br>বলুন: আমার মাবূদ জানেন... (২১:৪) |

হাফস ভার্সনের কোরানে ক্বালা শব্দটি পার্ফেক্ট টেনস, তাহলে মুহাম্মদ এখানে সাবজেক্ট, কিন্তু ওয়ারশ কোরানে কুল ইমপেরেটিভ; এর ফলে এই বাক্যে সাবজেক্ট হচ্ছেন আল্লাহ যিনি মুহাম্মদ অথবা মুসলিমদের আদেশ করছেন। একই ধরণের পার্থক্য দেখা যায় ২১:১১২ আয়াতে।
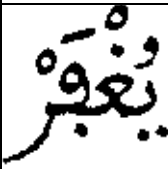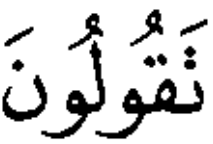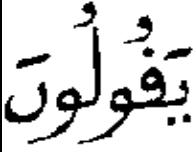
| | |
|---|---|
|  ওয়ালাইয়াখাফু |  |

| ... আর তার ভয় নেই ... ৯১:১৫ | ফালাইয়াখাফু<br>... অতএব, তার ভয় নেই... ৯১:১৫ |
|---|---|

## বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য

আরবি যুক্ত হরফ চেনার জন্য যে নোক্তা ব্যবহার করা হয় তাকে ইজম বলে। একই ধরণের হরফগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য নোক্তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: ـٮـ এই ধরণের চিহ্ন আরবি বর্ণমালায় পাঁচটি রয়েছে। এগুলোকে আলাদা করে চেনার জন্য পাঁচটি আলাদা নোক্তা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: ـبـ *বা',* ـتـ *তা',* ـثـ *ছা',* ـنـ *নুন,* ـيـ *ইয়া'*। নিচে দুটো কোরানের আরও কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হল।

| ইমাম হাফসের কোরান | ইমাম ওয়ারশের কোরান |
|---|---|
| نَغْفِرْ নাগফির<br>...আমি ক্ষমা করব... ২:৫৮ | يُغْفَرْ ইউগফার<br>...তিনি ক্ষমা করবেন... ২:৫৭ |
| দুটি শব্দের প্রথমে আলাদা হরফ থাকার কারণে অর্থ 'আমি' থেকে 'তুমি'তে বদলে গেছে। | |
| تَقُولُونَ তাকুলুনা<br>... তোমরা কি বলো... ২:১৪০ | يَقُولُونَ ইয়াকুলনা<br>...তারা বলে... ২:১৩৯ |

<table>
<tr><td><br>নুনশিজুহা<br>...আমরা উত্থাপন করি...২:২৫৯</td><td><br>নুনশিরুহা<br>... আমরা পুনরুজ্জীবিত/বাঁচিয়ে তুলি... ২:২৫৮</td></tr>
<tr><td colspan="2">এই দুটি শব্দের মূল হরফ আলাদা, ফলে এর অর্থ ভিন্ন হচ্ছে। দুটি আলাদা শব্দের মর্মার্থ এক কিন্তু অর্থ আলাদা।</td></tr>
<tr><td><br>আতাইতুকুম<br>আমি তোমাদের দিয়েছি ... ৩:৮১</td><td><br>আতায়নাকুম<br>আমরা তোমাদের দিয়েছি... ৩:৮০</td></tr>
<tr><td><br>ইউতীহিম<br>... তিনি তাদের দিবেন... ৪:১৫২</td><td><br>নূতীহিমু<br>... আমরা তাদের দিব... ৪: ১৫১</td></tr>
</table>

## স্বরবর্ণের পার্থ্যক্য

আরবি শব্দে উপরে নিচে ব্যবহৃত ছোট চিহ্ন (তাশখিল) স্বরবর্ণ চেনার কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা দেখব এই দুটি কোরানের একই স্বরবর্ণগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

| ইমাম হাফশের কোরান | ইমাম ওয়ারশের কোরান |
|---|---|
| মায়ালিকি ইয়াউমি<br>দিনের মালিক... ১:৪ | <br>মালিকি ইয়াউমি<br>দিনের রাজা... ১:৩ |
| হাফশ ভার্সনে খাড়া আলিফের কারণে শব্দটির এক্টিভ পার্টিসিপল অর্থ হয় মালিক কিন্তু ওয়ারশ কোরানে খাড়া আলিফ না থাকার কারণে শব্দটি নাউন 'রাজা' হয়ে যায়। | |
| <br>ইয়খদিউনা<br>... তারা ধোঁকাবাজি... ২:৯ | ইউখাদিউনা<br>... তারা ধোঁকাবাজি খুঁজে ... ২:৮ |
| ইয়াকযিবুনা<br>... তারা মিথ্যা বলে ... ২:১০ | ইউকাজজিবুনা<br>... তারা মিথ্যা বলেছিল (বা) অস্বীকার করেছিল... ২:৯ |
| বাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় হরফে আলাদা স্বরবর্ণ রয়েছে। একই শব্দ বাক্যে দুই বার ব্যবহার করা হয়েছে | |
| <br>হাত্তা ইয়াকুলা | <br>হাত্তা ইয়াকুলু |

<table>
<tr><td>... তাই তারা বলল... ২:২১৪</td><td>... তাদের বলা পর্যন্ত... ২:২১২</td></tr>
<tr><td>طَعَامُ مِسْكِينٍ তোয়ামু মিসকিন<br>...গরীব মানুষকে খাওয়ানোর মাধ্যমে পাপ মোচন...২:১৮৪</td><td>طَعَامُ مَسَٰكِينَ তোয়ামু মাসাকিনা<br>...গরীবদের খাওয়ানোর মাধ্যমে পাপ মোচন... ২:১৮৩</td></tr>
<tr><td>قَٰتَلَ কাতালা<br>কয়েকজন নবীর সাথে যুদ্ধ করেছিল ... ৩:১৪৬</td><td>قُتِلَ কাতিলা<br>এবং কয়েকজন নবীর সঙ্গে হত্যা করেছিল ... ৩:১৪৬</td></tr>
<tr><td colspan="2">এই শব্দে বাক্যে স্বরবর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে, এর ফলে এক্টিভ ভার্ব প্যাসিভ ভার্বে বদলে যায়। ৩:১৪৪ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।</td></tr>
<tr><td>رِسَالَتَهُۥ রিসালাতাহু<br>তার বার্তা... ৫:৬৭</td><td>رِسَٰلَتِهِۦ রিসালাতিহি<br>তার বার্তা... ৫:৬৯</td></tr>
<tr><td colspan="2">এই শব্দগুলোর শেষের দুটো হরফে আলাদা ভাউয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে শব্দের উচ্চারণ বদলে গেছে। হাফস ভার্সনে দ্বিতীয়া বিভক্তি বা কর্মকারক হয়েছে, কিন্তু ওয়ারশ কোরানে ষষ্ঠী বিভক্তিতে রূপ নিয়েছে। এতে করে বাক্যের গ্রামারের ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায়।</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
|  সিহরানি<br>... দুটোই জাদু ... ২৮: ৪৮ |  সাহিরানি<br>... দুই জন জাদুকর... ২৮:৪৮ |

ব্যকরণগত পার্থক্য ছাড়াও নিচে দুটি কোরানের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তুলে ধরা হল:

| رواية ورش عن نافع - دار المعرفة- دمشق<br>দামেস্কর মারিফার বর্ণিত দার আল ওয়ারশ কোরান | رواية حفص عن عاصم - مجمع الملك فهد- المدينة<br>বাদশা ফাহাদ কমপ্লেক্স মদিনার হাফস কোরান | |
|---|---|---|
| يُغْفَرْ<br>তিনি ক্ষমা করবেন | نَّغْفِرْ<br>আমরা ক্ষমা করব | البقرة<br>২:৫৮ |
| يَعْمَلُونَ<br>তারা করেছে | تَعْمَلُونَ<br>তুমি করেছ | البقرة<br>২:৮৫ |
| لَوْ تَرَى الذِينَ ظَلَمُواْ<br>জালিমদের শাস্তি দেখলে তুমি বুঝবে | لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ<br>যারা জালিম তারা শাস্তি দেখলে বুঝবে | البقرة<br>২:১৬৫ |
| فَنُوَفِّيهِمُ<br>আমরা তাদের পারিশ্রমিক দেব | فَيُوَفِّيهِمْ<br>তিনি তাদের পারিশ্রমিক দিবেন | عمران ال<br>৩:৫৭ |

| تَبْغُونَ<br>তুমি খোঁজ | يَبْغُونَ<br>(তারা) খোঁজে | عمران ال<br>৩:৮৩ |
|---|---|---|
| تُرْجَعُونَ<br>তুমি সমীপে ফিরবে | يُرْجَعُونَ<br>তারা সমীপে ফিরবে | عمران ال<br>৩:৮৩ |
| تَجْمَعُونَ<br>তোমার সঞ্চয় | يَجْمَعُونَ<br>তাদের সঞ্চয় | عمران ال<br>3:157 |
| نُدْخِلْهُ<br>আমরা তাকে প্রবেশ করাবো | يُدْخِلْهُ<br>তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন | النساء<br>৪:১৪ |
| كَأَن لَّمْ يَكُن<br>সেখানে নেই (m) | كَأَن لَّمْ تَكُن<br>সেখানে নেই (f) | النساء<br>৪:৭৩ |
| نُفَصِّلُ<br>আমরা বর্ণনা করিl | يُفَصِّلُ<br>তিনি বর্ণনা করেন (s) | يونس<br>১০:৫ |
| نَحْشُرُهُمْ<br>আমরা তাদের একত্রিত করব, | يَحْشُرُهُمْ<br>তিনি তাদের একত্রিত করবেন | يونس<br>১০:৪৫ |
| يُوحى<br>তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন | نُّوحِى<br>আমরা অনুপ্রাণিত করেছিলাম | يوسف<br>১২:১০৯ |
| تُوقِدُونَ<br>তুমি উত্তপ্ত হও | يُوقِدُونَ<br>তারা উত্তপ্ত হয় | الرعد<br>১৩:১৭ |
| مَا تَنَزِّلُ<br>তুমি নিচে প্রেরণ করো না | مَا نُنَزِّلُ<br>আমরা নিচে প্রেরণ করি না | الحجر<br>১৫:৮ |

| | | |
|---|---|---|
| تَقُولُونَ<br>তুমি বলো | يَقُولُونَ<br>তারা বলে | الإسراء<br>১৭:৪২ |
| قُل<br>বলুন! | قَالَ<br>সে (বলল) | الأنبياء<br>২১:৪ |
| لِيُحْصِنَكُم<br>(m) রক্ষা করে | لِتُحْصِنَكُم<br>রক্ষা করে (f) | الأنبياء<br>২১:৮০ |
| تَدْعُونَ<br>তুমি ডাকো | يَدْعُونَ<br>তোমরা ডাকো | الحج<br>২২:৬২ |
| يُخْفُونَ<br>তারা লুকায় | تُخْفُونَ<br>(তুমি) লুকাও | النمل<br>২৭:২৫ |
| يُعْلِنُونَ<br>তাদের ঘোষণা | تُعْلِنُونَ<br>(তুমি) ঘোষণা | النمل<br>২৭:২৫ |
| تُجْبى<br>আনীত (f) | يُجْبَى<br>আনীত (m) | القصص<br>২৮:৫৭ |
| تَدْعُونَ<br>তুমি ডাকো | يَدْعُونَ<br>তারা ডাকে | لقمان<br>৩১:৩০ |
| كَثِيرًا<br>বহু সংখ্যক | كَبِيرًا<br>মহৎ | الأحزاب<br>৩৩:৬৮ |
| نَحْشُرُهُمْ<br>আমরা সকলকে একত্রিত করবো | يَحْشُرُهُمْ<br>তিনি সকলকে একত্রিত করবেন | سبإ<br>৩৪:৪০ |

| نَقُولُ<br>আমরা বলবো | يَقُولُ<br>তিনি বলবেন | سبإ<br>৩৪:৪০ |
|---|---|---|
| أَفَلاَ تَعْقِلُونَ<br>তুমি কি বুঝবে না? | أَفَلاَ يَعْقِلُونَ<br>তারা কি বুঝবে না? | يس<br>৩৬:৬৮ |
| يَتَذَكَّرُونَ<br>তারা ফিরিয়ে দেয় (reflect) | تَتَذَكَّرُونَ<br>(তুমি) ফিরিয়ে দাও (reflect) | غافر<br>৪০:৫৮ |
| يَكَادُ<br>প্রায় (m) | تَكَادُ<br>প্রায় (f) | الشورى<br>৪২:৫ |
| يَفْعَلُونَ<br>তারা করে | تَفْعَلُونَ<br>(তুমি) করো | الشورى<br>৪২:২৫ |
| بِمَا<br>এটা সেটাই | فَبِمَا<br>(তখন) এটা সেটাই | الشورى<br>৪২:৩০ |
| فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ<br>তুমি জানাবে | فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ<br>তারা জানতে পারবে | الزخرف<br>৪৩:৮৯ |
| تَغْلِى<br>সেটি ফুটতে থাকবে (f) | يَغْلِى<br>সেটি ফুটতে থাকবে* (m) | الدخان<br>৪৪:৪৫ |
| نُدْخِلْهُ<br>আমরা তাকে প্রবেশ করাব | يُدْخِلْهُ<br>তিনি প্রবেশ করাবেন | الفتح<br>৪৮:১৭ |

| نُعَذِّبْهُ<br>তাকে আমরা শাস্তি দিব | يُعَذِّبْهُ<br>তিনি শাস্তি দিবেন | الفتح<br>৪৮:১৭ |
|---|---|---|
| يَقُولُ<br>সে বলবে | نَقُولُ<br>আমরা বলব | ق<br>৫০:৩০ |
| نُدْخِلْهُ<br>আমরা তাকে একত্রিত করব | يُدْخِلْهُ<br>তিনি তাকে একত্রিত করবেন | التغابن<br>৬৪:৯ |

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পুরো হাফস কোরানে আল্লাহ তার বান্দাদের কখনো সতর্ক করছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, জান্নাতের প্রতি প্রলুব্ধ করছেন, নবী ও মুসলিমদের আদেশ করছেন, আবার কখনো নিজের মহিমা বর্ণনা করছেন, অর্থাৎ কোরান এখানে বক্তা। কিন্তু ওয়ারশ কোরান লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, এখানে বান্দারা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করছে, তার কাছে আশ্রয় চাইছে, জান্নাতের সৌন্দর্য বর্ণনা করছে, আল্লাহর সতর্কতা স্মরণ করছে, অর্থাৎ এই কোরান পাঠকারী হলেন বক্তা। ব্যাকরণগত দিক থেকে ওয়ারশ কোরান আত্মবাচক সর্বনামে লিখিত কিন্তু হাফস কোরান সমীপ্যবাচক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, ব্যক্তিবাচক ইত্যাদি সর্বনামে লিখিত। ব্যাকরণের কঠিন ভাষায় এটা হয়ত বোঝা সম্ভব না, কিন্তু আপনি যখন দেখবেন যে পুরো ওয়ারশ কোরান মানবজাতির জন্য ভক্তিমূলক গ্রন্থ এবং হাফস কোরান উপদেশ মূলক গ্রন্থ তখন কোরানের ঐশ্বরিকতা নিয়ে সন্দেহ উঠতেই পারে; কারণ আপনি হয়ত মনে করতেই পারেন কোরান হয়তোবা একাধিক ডায়ালেক্ট বা আহরূফে নাযিল হতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে দুটি কোরান কখনোই আলাদা আলাদা ভক্তিমূলক ও উপদেশমূলক আয়াত হিসেবে নাযিল হতে পারে না। এটা মুসলিমদের ইমানী বিশ্বাসের নৈতিকতার সঙ্গে কখনোই যাবে না, তা সে যতই মৌলবাদী হোক না কেন। এর থেকে বেশি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য হতে পারে না।

## সংখ্যার পার্থক্য

আমরা ইতোমধ্যে দুটো কোরানের তিন ধরণের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছি: বর্ণের পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য সূচক নোক্তা ও স্বরবর্ণ কিন্তু দুটো কোরানের মাঝে এ ধরণের পার্থক্য কতগুলো রয়েছে। কিন্তু এই দুটি কোরানের মাঝে আদৌতে কতগুলো পার্থক্য রয়েছে? এ সম্পর্কে ইসলামিক বইয়ে কিছু রেফারেন্স দেয়া রয়েছে। নিচের বইটির নাম "The Readings and Rhythm of the Uthman (Qur'anic) Manuscript"

مصحف القراءات والتجويد
بالرسم العثماني

وهو يضم:
١- الرمز التلويني لتعليم أحكام التجويد مطبقاً على المصحف الشريف بكامله.
٢- المواطن التي خالفت فيها كل من القراءات التالية:
قالون - ورش - شعبة - السوسي - الدوري
٣- القواعد الأساسية التي تميزت بها كل من القراءات السالفة الذكر.
٤- بحث مختصر مفيد لأحكام التجويد.
٥- معجم مفهرس لمواضيع القرآن الكريم.

الخطاط عثمان طه
الطبعة الأولى
١٤٠٢هـ

تم الطبع بإذن خاص من الدار الشامية للمعارف بدمشق
وبإذن خاص من الدكتور محمد حسن الحمصي
وبموجب براءة اختراع صادرة عن دائرة حماية الملكية ببيروت

مؤسسة الإيمان
هاتف: ٠١/٥٥٩٣٥٧
فاكس: ٠١/٥٥٩٣٥٨

এই বইতে লেখক কোরানের হাফস ভার্সন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোন আয়াতে অন্য কোরানের সঙ্গে পার্থক্য থাকলে তা আন্ডারলাইন করে দিয়েছেন। তারপর আলাদা করে মার্জিনের বাহিরে তা উল্লেখ করেছেন। আলাদা তেলাওয়াত কারীদের জন্য লেখক আলাদা রঙ ব্যবহার করেছেন। মার্জিনের বাহিরে যদি লাল কালিতে শব্দ লেখা থাকে তাহলে তা ইমাম ওয়ারশের কোরান। দয়া করে, নিচের পৃষ্ঠার আন্ডারলাইনগুলো সনাক্ত করে মার্জিনের বাহিরে লাল রঙের শব্দগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

উক্ত কোরানে লাল রঙের শব্দের সংখ্যা ১,৩৫৪টি। অর্থাৎ হাফস এবং ওয়ারশ কোরানের মাঝে ১,৩৫৪টি পাঠগত পার্থক্য রয়েছে।

## বাসমালা পার্থক্য

দুটো কোরানগুলোর মাঝে আরেও এক ধরণের পার্থক্য রয়েছে। এটিকে বাসমালা পার্থক্য বলে। বাসমালা বাক্যটি, 'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে' শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। সুরা ৯ ছাড়া হাফস ও ওয়ারশ দুটো ভার্সনেই সবগুলো শব্দে বাসমালা রয়েছে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে আবিষ্কৃত সানাই পাণ্ডুলিপিতে ৯ নং সুরায় বাসমালা লক্ষ্য করা গেছে। যাই হোক, উক্ত ইমামদের বাসমালা ব্যাবহারের মাঝে পার্থক্য ছিল। ইমাম হাফস মনে করতেন বাসমালা কোরানেরই অংশ এবং তিনি সেটি সহ কোরানের আয়াত সংখ্যা হিসাব করতেন, কিন্তু ইমাম ওয়ারশ মনে করতেন বাসমালা এক ধরণের দোয়া, যা প্রতিটি সুরার শুরুতে পাঠ করা হয় সুরার নামের মতো কিন্তু এটি কোরানের কোন অংশ না। আবু আম্মার ইয়াসির এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন।

বাসমালা হল একটি বাক্য যা কোরানে সুরা আত-তওবা ছাড়া প্রতিটি সুরার সম্মুখে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি মুসলিমকে তা পাঠ করা উচিত,

*'বিসমিল্লাহ আর-রহমান আর-রাহীম'*

*(পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে)*

কোরানের স্কলারদের মাঝে এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। সুরা আল ফাতিহার কথা ধরলে, এটি কেবল সোওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। এর মাধ্যমে সুরার শুরু ও শেষ সনাক্ত করা যায়। স্কলাররা একমত হয়েছেন যে বাসমালা সুরা আত-তওবা এবং কোরানের ২৭:৩০ আয়াতের কোন অংশ না...। ইমাম আস-শাফি (মৃত্যু

২০৪ হিজরি), ইমাম আহমেদ (মৃত্যু ২৪১ হিজরি) সহ কিছু স্কলারগণ দাবী করেন যে বাসমালা কোরানের অংশ... ইমাম মালিক (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি) ও আবু হানিফা (মৃত্যু ১৫০ হিজরি) মনে করতেন এটি কোরানের অংশ নয়...। শ্রেণী বিভাগের উপরে ভিত্তি করে বলা যায়, কিরাতগণ নিজেদের মাঝে সুরা ফাতিহা সহ অন্য সুরায় বাসমালার ব্যবহার নিয়ে বিবাদ করতেন। কারীদের মাঝে, যেমন ইবনে কাছির আসিম এবং আল কিসাই মনে করতেন আয়াতের শুরু সুরা থেকেই হওয়া উচিত।[85]

উপরে বাসমালা নিয়ে আলোচনার সারমর্ম হল, ইসলামি শিক্ষার ভিত স্থাপনকারী চারজন ইমাম- হানাফি, মালিকি, শাফি এবং হানবালি স্কুলের শিক্ষকরা প্রতিটি সুরার সম্মুখে ব্যবহৃত বাসমালা শব্দটি কোরানের অংশ কিনা এই নিয়ে বিবাদ করতেন। ইমাম আস-শাফি এবং ইমাম আহমেদের বিশ্বাস ছিল এটি কোরানের অংশ এবং ইমাম মালিকও আবু হানিফা বিশ্বাস করতেন এটি কোরানের অংশ না। এর ফলশ্রুতিতে এই নিয়মগুলো থেকে যে স্কলাররা বেড়িয়ে এসেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একে অপরের থেকে ভিন্ন। ইবনে কাথিরের, আল কিসাই, এবং আবু বকর আসিম (হাফস) এর ক্ষেত্রে বাসমালা কোরানের অংশ, কিন্তু নাফি (ওয়ারশ), আবু আমর আল আলা, ইবনে আমির, হামজা, আবু জাফর, ইয়াকুব আল হাশিমি এবং খালাফ আল বাজ্জারের মতো বেশিরভাগ স্কলারদের মতে বাসমালা কোরানের অংশ নয়। কিন্তু বাসমালা নিয়ে আমাদের সহজ অভিমত হল, হাফস কোরানে বাসমালা কোরানের একটি আয়াত; ওয়ারশ কোরানে বাসমালা হল একটি দোয়া। বাসমালা নিয়ে কোরানের এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে ১১৩ বার। এবং প্রতিটির সঙ্গে ৪টি করে শব্দ যোগ হয়েছে। অর্থাৎ ৪৫২টি অতিরিক্ত শব্দে হাফস ও ওয়ারশ কোরানের পার্থক্য রয়েছে।

---

[85] Abu Ammaar Yasir Qadhi, *an Introduction to the Sciences of the Qur'aan*, pp. 157-158.

## উচ্চারণ ভঙ্গি মোতাবেক কোরানের অর্থের পার্থক্য

আমি মুসলিমদের প্রায়ই বলি কোরানের কথ্য ভাষা, বাচনভঙ্গি, কথন পদ্ধতি অনুযায়ী কোরানের অর্থের মাঝে প্রভাব পড়ে। প্রাচীন কালে কোরানের বাচনভঙ্গি নিয়ে মুসলিমদের মাঝে বড় ধরণের বিবাদ দেখা যায়। তাদের সঙ্গে আমার ক্রিয়া সকর্মক নাকি অকর্মক, সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল, বাক্যে ব্যবহৃত গ্রামার কীভাবে বুঝতে হবে, বাসমালা কোরানের অংশ কিনা এসব নিয়ে আলোচনা হয়। এগুলোর মাধ্যমে কোরানের অর্থ প্রভাবিত হয়। প্রমাণই সাক্ষ্য দেয়:

সুবিহ আল সালিহ এটিকে সাতটি আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

- ব্যাকরণগত সূচকের পার্থক্য (ইরাব।)
- ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য।
- বিশেষ্য বাচক শব্দ যেমন: বস্তুবাচক, সমষ্টি বাচক, পুরুষবাচক, নারী বাচক শব্দেও অর্থের পার্থক্য রয়েছে।
- একে অপরের প্রতি কল্পিত শব্দের পার্থক্য।
- আরবি ভাষায় রিভার্সাল শব্দের প্রকাশ গত পার্থক্য।
- আরব প্রথা অনুযায়ী কিছু ছোট শব্দ যুক্ত ও বাদ দেয়া গত পার্থক্য
- কথ্য ভাষার পার্থক্য।

আমরা এই তালিকায় বাসমালার অবস্থা জনিত পার্থক্যও যুক্ত করতে পারি। অতএব, পার্থক্যের এই দাবীগুলো শুধু কথ্য ভাষার বিষয় এবং এর মানে এই নয় যে এর অর্থগুলো ভুল। এসম্পর্কিত প্রমাণগুলো তাই বলে।

কোরান সম্পর্কিত যে নূরানি দাবীগুলো করা হয় তা এক কথা ভুল বা মিথ্যা। ইসলামিক এভিডেন্সগুলোই বয়ান করে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের কোরান প্রচলিত রয়েছে। এর সঙ্গে প্রাচীন কোরানের পার্থক্যও বিশাল। বর্তমান কোরানের পার্থক্যর ক্ষেত্রে মূল শব্দগুলোর পার্থক্য, নোক্তার পার্থক্য, ক্রিয়ার পার্থক্য, এবং

বাসমালার পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই সমস্ত পার্থক্যের ফলে কোরানের অর্থগত পরিবর্তন ঘটে। একটি কোরান অপরটির থেকে অভিন্ন কোন গ্রন্থ নয়। এই সামান্য শব্দগুলো মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর। কোরানে অবস্থিত প্রথম সুরাটির বিপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে বলা যায় সুরা ফাতিহা কোরানের কোন অংশ নয়, তবুও সেটি কোরানের প্রথম সুরা হিশেবে স্থান করে নিয়েছে। নিকট প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে আমরা এধরণের পদ্ধতি দেখতে পাই। কোরিয়ান স্টাইলে, গ্রন্থ শুরুর পূর্বে অবতরণিকা ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশীয় মহাভারতেও অবতরণিকার উপস্থিতি পাই আমরা। তেহরানের তাদকিরাত আল-উম্মাহ অফ মুহাম্মদ বাকির মজলিস এডিশনের কোরান এবং কায়রো এডিশনের কোরানে আমরা সম্পূর্ণ দুই ধরণের দুটি ফাতিহা সুরা দেখতে পাই। কোরানের আহরুফ জনিত পার্থক্য গুলো নিয়ে আলোচনা একটি বিশাল অধ্যায়ের অবতারণা করবে। সম্ভবত কোন আলাদা গ্রন্থও এই বিষয় নিয়ে লেখা সম্ভব।

[স্যামুয়েল গ্রিনের আর্টিকেল THE DIFFERENT ARABIC VERSIONS OF THE QUR'AN এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ]

## উপসংহার

এখন পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে ভিত্তি করে একটি কথাই বলা যায়, মুসলিমরা আমাদের ইসলাম ও কোরান সম্পর্কে যা বলে তার সঙ্গে তথ্য প্রমাণের কোন মিল নেই। কিন্তু মুসলিম স্কলাররা এতটুকু স্বীকার করে যে তাদের কাছে সপ্তম শতাব্দীর বা উসমানের সময়ের একটি পাণ্ডুলিপিও নেই। প্রতিটি ম্যানুস্ক্রিপ্টই নুন্যতম অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত। অর্থাৎ, প্রথম ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখিত হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর নিদেনপক্ষে ৬০-৭০ বছর পর। এর পূর্ব পর্যন্ত কোন ম্যানুস্ক্রিপ্ট কখনো ছিল না। মুহাম্মদের সঙ্গে উক্ত ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলোরও কোন সম্পর্ক নেই। তিক্ত হলেও সত্য, মুহাম্মদের মৃত্যুর পরপরই কোরানের বেশিরভাগ অংশ হারিয়ে গেছে,

যতটুকু অবশিষ্ট ছিল আব্দুল মালেক সেগুলো সংকলিত ও পরিবর্তিত করে আরব সাম্রাজ্যবাদ প্রচারে কাজে লাগিয়েছেন।

কোরান উসমানের সময়কালে সংকলিত হয়েছে এটা ভাবার কোন কারণ নেই, কেননা প্রমাণগুলো ভিন্ন সাক্ষ্য দিচ্ছে। আব্দুল মালেকই প্রথম শাহাদা সম্বলিত মুদ্রা ছাড়েন, ডোম অব দ্য রক নির্মাণ করেন, তিনিই প্রথম কোরান সংকলন করেন, তিনিই নির্ধারণ করেন আরবে ইসলামের অবস্থান কী হবে, তিনিই নির্ধারণ করেন জুবায়েরের মুহাম্মদ ইসলামের পয়গাম্বর হবেন নাকি আবু বকর, আব্দুল মালেকই প্রথম মুসলিম শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আব্দুল মালেকই ইসলাম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন; আব্দুল মালেকের সময়কাল থেকেই মুসলিমদের কেবলা পেত্রা থেকে মক্কার দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। খলিফা জুবায়েরের সঙ্গে যুদ্ধে আব্দুল মালেক ক্বাবাকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেন। এরপর আবার তা নির্মাণ করেন? কেন? ক্বাবার উপরে তার কিসের ক্ষোভ ছিল? কোন ক্ষোভই আসলে ছিল না, বরং তিনিই ক্বাবাকে নির্মাণ করেছেন। এক কথায়, সব কিছুর শুরু হয়েছে আব্দুল মালেকের হাত ধরে। একারণেই ইসলামের ইতিহাসে আব্দুল মালেকের নাম ঘুরে ফিরে বারবার আসে। কেউ যদি মনে করে, আব্দুল মালেককে ছাড়া ইসলামের ইতিহাস সৃষ্টি করবেন তবে তা সম্ভব না। কে ছিলেন এই আব্দুল মালেক? শুধুই খলিফা তার উপাধি ছিল না। তিনি ৬৮৫ থেকে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি ছিলেন আরবের সবচাইতে মহান সংস্কারক। তিনিই আরবদের নতুন পরিচয় সৃষ্টি করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, একটি নতুন পরিচয় সৃষ্টি করতে আপনি কী করবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে চলুন মানবজাতির ইতিহাসের উপরে সংক্ষিপ্ত নজর বুলিয়ে আসি। মানব সভ্যতার একেবারে শুরুর দিকে নগরগুলো যখন নদী কেন্দ্রিক ছিল তার পূর্বে কৃষি কাজের সুফল শুধু একজন মানুষই পেত। নগর সভ্যতায় কৃষি কাজ শুরু হতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৬,০০০ অব্দ পর্যন্ত। প্রাচীন কালে কৃষি কাজের মাধ্যমে মানুষের খাবার সংগ্রহ এত স্বল্প ছিল যে তাতে কোন রকমে মাত্র একজন শিকারির পেট ভরতে পারতো। সমস্ত নগরীর প্রধান পেশা

যখন কৃষি হয় তখন শুধু মাত্র এক অথবা দুই ধরণের ফসলের উপরেই ৯০-৮০ শতাংশ ক্যালরি নির্ভর করত। মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে এটি ছিল গম এবং যব। এই দুইটি একই ঋতুর ফসল। ফলে প্রাচীন কৃষিজীবী মানুষকেও এই দুটি ফসল একই সময়ে উৎপাদন করতে হতো। অর্থাৎ সারা বছরের খাদ্য একত্রে আবাদ করতে হতো। সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে হতো পুরো এক বছরের জন্য। একবার আবাদি ফসল নষ্ট হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত নগরের উপরে অন্তত পক্ষে আগামী বারো মাসের জন্য দুর্ভিক্ষ নেমে আসা। কাজেই দেখা যাচ্ছে নগর নিয়ন্ত্রিত হতো ফসলের দ্বারা। ফসলের নিয়ন্ত্রণ এবং হিসাব রাখার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রথম লেখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ভাষা পদ্ধতিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সুমেরীয়দের। তাদের গণনা পদ্ধতি দশমিকের বদলে বারো ছিল। সুমেরীয়দের গণিতের এই জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা রাত এবং দিনকে ১২ ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে ৬০ মিনিটে, আর মিনিটকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করে নিয়েছি।

বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয় প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শুরু হয় রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। শত শত মানুষ এক সঙ্গে বাস করতে গেলে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই জটিল পরিস্থিতিকে সামলানোর জন্যই প্রয়োজন পড়ে সরকারের। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রম ধীরে ধীরে সেই নগরের বা বসতির মাঝে গড়ে উঠতে থাকে। ছোট ছোট বসতিগুলো বিশাল নগরে পরিণত হতে থাকে তখনই। বিশাল নগরের অপ্রতুল কৃষি ব্যবস্থার ফলেই এক সভ্যতা আরেক সভ্যতার সঙ্গে লেনদেন করতে শেখে। যত অধিক পণ্যের লেনদেন করা তারা শিখতে থাকে তত দ্রুত একেকটা সভ্যতা এগিয়ে যেতে থাকে। আমরা আগেই বলেছি, দীর্ঘ দূরত্বের ব্যবসা ও সঞ্চার শহুরে সভ্যতার জন্য অপরিহার্য একটি ব্যবস্থা। প্রাচীন এই লেনদেন ব্যবস্থা যে সভ্যতার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল সেই সভ্যতাগুলোই পরবর্তীকালে মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ব্যবসায়ের সেই যাত্রা পথগুলো রোম হয়ে পারস্যের খাড়িতে এসে মিশত। সেখান থেকে সভ্যতা জুড়ে যায় ভারতবর্ষের সঙ্গে। লেনদেনের এই বিশাল

নেটওয়ার্কের সঙ্গে জুড়ে যায় সমগ্র ইউরেশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা। মরুভূমিতে প্রবেশের অপেক্ষা করতে হয় মধ্যযুগ পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে, অনিবার্য কারণে এই সভ্যতাগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহান সংস্কৃতিগুলোর ভৌতিক বিনিময় ঘটিয়েছিল। আমাদের পৃথিবীর বর্তমান ব্যবসায়িক পরিকাঠামো এখন পর্যন্ত এই প্রাচীন পদ্ধতিতে কাজ করে। আমরা প্রথমে ব্যবসায়ের জন্য একটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হই। নেটওয়ার্ক পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয় একটি কেন্দ্রের। সেই কেন্দ্রে মালামালের পরিমাণ, ব্যবসায়ের অংশীদারের পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, খাজনা গ্রহণ, ইত্যাদি সবকিছু নির্ধারিত হয় কে কতটা শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ তার উপরে। মূলত সাম্রাজ্যবাদী মহান শক্তিগুলোই এই কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করত। রাতারাতি প্রত্যন্ত মরুভূমি থেকে উঠে এসে দাবী করলেই কেউ মহান হয়ে যায় না। আমাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, মেধা, শ্রম সবকিছু জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। এশিয়া ও আফ্রিকায় এখনও কিছু স্থান রয়েছে যেখানে জীবন ধারণ করার জন্য এখনও প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কেননা মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে এই অঞ্চলগুলো সেই ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের বাহিরে ছিল।

লৌহ যুগে প্রবেশের পর মানুষ মোটামুটি অজেয় হয়ে যায়। এই জয়ের নেশা মানুষকে শুধু একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং অন্যের উপরে প্রতিপত্তি লাভের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষ তৈরি করতে থাকে সাম্রাজ্য। ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল ২.১ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বে অ্যালেক্সান্ডারের সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল ২ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। ৫০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনের সাম্রাজ্য ছিল ২.৩ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল, ১১৭ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল ১.৯ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। নতুন টেকনোলজি আর মানুষের লোভের বশে পড়ে দুই হাজার বছর ধরে সাম্রাজ্যের প্রসার হতে থাকে। তাদের হাত ধরেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ইউরেশিয়া-অ্যাফ্রোশিয়ার ব্যবসায়িক লেনদেন। একক কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বিশাল অঞ্চলকে জুড়তে গিয়ে যেভাবে যেভাবে সাম্রাজ্য বাড়তে থাকে সেভাবেই বাড়তে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস। সেটা হল এক ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস।

সময়ের সাথে এক ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ধারণা অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয় ছিল। এটা একদিন না একদিন ঘটতই, অপেক্ষা শুধু সময়ের। এই বিশ্বাস থেকেই ইহুদী ধর্মের উদ্ভব হয়, যা থেকে পরবর্তীতে সৃষ্টি খৃষ্টান ধর্মের, এবং ইসলামের। একই সময়ে বাড়তে থাকে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম। আধুনিক যুগের পাঁচটি প্রধান ধর্মের উৎপত্তি সবগুলো এই সময়েই ঘটেছে।

সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে কিছু মহান সাম্রাজ্য যা এর আগে কখনই একে অন্যের সঙ্গে মেলেনি তারা একে অন্যের সঙ্গে লেনদেন শুরু করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। পাঁচ লক্ষ বছর আগে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টির ফলে চীন বাকী পৃথিবী থেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত চীনা ব্যবসায়ীরা রোমানদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারেনি, অন্তত সিল্ক রোড তৈরি হওয়া পর্যন্ত তো নয়ই। চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে রোমে যাওয়ার এই পথটি মানব ইতিহাসের পুরো গতিধারাকেই বদলে দেয়। খৃষ্টপূর্ব ১০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র তিন শতকে যে সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক পণ্যের যে আদানপ্রদান ঘটে তা মানব ইতিহাসে আগে কখনোই ঘটেনি। মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে রোমান সাম্রাজ্য এবং চীনের হান রাজবংশ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এই নেটওয়ার্ক ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ছাড়াও ধর্মের বিস্তার ঘটায়। ৩১২ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টানটিন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফলে খৃষ্ট ধর্ম শুধু ইউরোপ ও পশ্চিমের প্রধান ধর্মই হয়েছিল না, বরং তা পরবর্তী সম্রাটদের ঈশ্বর কর্তৃক কৃপা বর্ষণের মাধ্যমে পুরো রোমান সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকে। এর ঠিক পরপরই আসে ইসলাম। রোমান সাম্রাজ্যের চাইতে আড়াইগুণ বেশি অঞ্চল দখল করে ইসলাম মাত্র এক শতকের মাঝেই। অ্যাফ্রো-ইউরেশিয়ার মাঝ বরাবর অবস্থান থাকার কারণে আরব বণিকরা পৃথিবীর এমন স্থানে ব্যবসা শুরু করে যেখানে এর পূর্বে কখনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। আরবরাই তখন চীনের সঙ্গে লেনদেন করত, আরবরাই সমুদ্র পথে আটলান্টিক মহাসাগরকে ব্যবহার করা শুরু করে। আরবরা নিজেদের এই ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের কেন্দ্র হিশেবে গড়ে তোলে খুব দ্রুত। কিন্তু এসব ঘটেছিল আরবদের রাজ্য বিস্তারের পর।

এর পূর্বে বিশ্ব সভ্যতায় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় মক্কা তথা আরবদের কোন অবদান ছিল না। তাছাড়া আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মক্কা না; বরং সিরিয়া, বাগদাদ ও ইস্তাম্বুল ছিল।

খেয়াল করুন, আরবরা সে সময় কেবল মাত্র বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক, জেরুজালেম, কায়রো জয় করেছিল। লাভান্ত দখলের পর তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে পূর্বের ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমের স্পেনের দিকে পারি জমায়। সবকিছুই ঘটেছিল সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে গিয়ে। মিথলজি অনুযায়ী তখন সমস্ত ওহী নাযিল হত জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানদের প্রতি, ইসহাকের বংশেই সমস্ত পয়গাম্বরেরা জন্মাতেন। কিন্তু আরবরা ছিল জাতিগত ভাবে ইসহাকের সৎভাই। আরব জাতির পিতা ইসমাইলের বংশের নাবাতিয়ানরা ছিল, হাজেরিনরা ছিল, মাঘরেইগণ ছিল, আরব বেদুইন ও সারাসিনরা ছিল। এই দীর্ঘ বংশ তালিকায় আরবদের অভাব ছিল শুধু মাত্র একজন পয়গাম্বরের। আপনার দখলে একটি বিশাল সাম্রাজ্য যার প্রতিদ্বন্দ্বীরা চারিদিক থেকে ফাঁদ পেতে বসে আছে আপনাকে উৎখাত করার জন্য। আপনি কী করবেন? নিঃসন্দেহে ঐশ্বরিক স্বত্বার কৃপা লাভের চেষ্টা করবেন। এরই ফলশ্রুতিতে একজন পয়গাম্বর সৃষ্টি করাটা হল সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। যে পয়গাম্বর দাবী করবে সব কিছু জন্মগতভাবে তার, ধর্মীয় অনুভূতির শক্তিতে সাধারণ জনগণ এর বিরোধিতাও করতে পারবে না। আরবরা যখন ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল সেই সময়টাতে গিয়ে মুহাম্মদকে সৃষ্টি করে ধর্মীয় অনুভূতি দেয়ার চেষ্টা করে এবং পুরো আরব সাম্রাজ্যকে একক মতৈক্যে নিয়ে আনে। এই মতৈক্যের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। তাই আব্দুল মালেক বিভিন্ন সৌর্স যেমন: ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, প্রাচীন পুঁথি, ভক্তিমূলক কবিতা তন্ন করে খুঁজে, ধার করে, চুরি করে একটি আসমানি কিতাব তৈরি করেন যা আজ কোরান হিসেবে পরিচিত। কোরানকে বিশ্লেষণ করলে উপরের সবকটি সৌর্স পাওয়া যাবে। আস্ত কোরান একটি ধার করা গ্রন্থ। ৭০% কোরানের সঙ্গে ইহুদী এপোকপেট এবং খ্রিষ্টীয় সেকটারিয়ান রাইটিং এর মিল পাওয়া যায়। কোরানে নতুন কিছু নেই। কোরানের লেখকেরা উপর নিচ, ভিতর

বাহির পুরোটাই অন্য ধর্মগুলো থেকে ধার করেছেন। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন কোরান একারণেই দেখা যায়। ড. আর্থার জেফ্রি ১১টি কোরান গবেষণা করে ৫০,০০০+ এরও বেশী পার্থক্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে। কোরানের ভিত্তি যদি মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে তবে কীভাবে ইসলাম হাজার বছর ধরে টিকে আছে? মনে রাখতে হবে কোরানের ঐশ্বরিকতা কোন ছোটখাটো মিথ্যা না। এটি বিশাল ও সংঘবদ্ধ মিথ্যা। বড় মিথ্যা মতবাদগুলো শক্তিশালী হয়। এই ধরণের মিথ্যাগুলো শ্রবণকারীর উপরে মানসিক প্রভাব বিস্তার করে। মিথ্যা যত বড় হয় তা তত বিশ্বাসযোগ্য হয়। হিটলার তার গ্রন্থ মেইন কাম্ফে লিখেছেন, “The broad mass of a Nation will more easily fall victim to a big lie than to a small one.” বড় মিথ্যাগুলোর প্রভাবিত করার ক্ষমতা অসাধারণ, কেননা এটা সরাসরি শ্রোতার বোধ শক্তির শিকড়ে গিয়ে বাসা বাঁধে। আলি সিনার মতে, একজন সাধারণ মানুষ তার কথা অবিশ্বাস করা হবে বা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা হবে এসব ভেবে বড় মিথ্যা বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। জীবনে মিথ্যা কথা বলেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল, কিন্তু মিথ্যা ছোট হলে আগে অথবা পরে তা ধরা পড়বেই। বড় মিথ্যাগুলো এতটাই অদ্ভুত হয় যে তা শুনে শ্রোতা চমকে ওঠে। মিথ্যা যখন বিরাট হয়, তখন একজন গড় পড়তা মানুষ ভেবে অবাক হয় যে এত বড় কথা কীভাবে এমন অকপটে বলা সম্ভব। বড় মিথ্যাগুলো রাজনীতিতে সবচে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। জর্জ ওরেলের মতে, রাজনৈতিক ভাষা… মিথ্যাকে সত্য নিষ্ঠটার ছাঁচে ফেলে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর সচ্চরিত্রকে হত্যা করে নির্মল রূপ প্রদান করা হয়েছে। আজ সানাই ম্যানুস্ক্রিপ্ট, বার্মিংহাম ফোলিও, বিভিন্ন ভার্সনের মাধ্যমে কোরানের ঐশ্বরিকতা যখন মলিন হয়ে যাচ্ছে ইসলামের আসল রূপ তখন উপস্থিত হচ্ছে। ইসলাম আরবের রাজনৈতিক মুভমেন্ট ছাড়া কিছুই না। আরবরা যখন রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিল তখন মুহাম্মদের দর্শনও অন্যদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে ফলে কোরানকে ঐশ্বরিকতা প্রদান করে আল্লাহর কৃপা লাভ করা শুধু সময়ের দাবী না, খুব

জরুরী হয়ে উঠেছিল। কোরানকে ধর্মীয় কাঠামো দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল আরব নেতাদের কাছে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। আরবরা শুধু অন্যদের উপরে ইসলামকে আরোপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তাদের গোঁড়া ধর্মচিন্তাকেও কোরানের ঐশ্বরিকতার মাধ্যমে দমন করেছিল; যেন আরবরা যদি কখনো চলেও যায় সাধারণ জনগণ আবার তাদের পুরনো বিশ্বাসে ফিরে গিয়ে মানসিক আরব দাসত্ব থেকে কোনভাবেই মুক্ত হয়ে না যায়। এটি ভীষণ বিরল একটি রাজনৈতিক প্রতিভা। যা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর সমসাময়িক আরব নেতাদের মাঝে ছিল। কোরান নিয়ে সন্দেহ খোদ মুহাম্মদের সাহাবীরাই করতেন। কিন্তু শুধু মাত্র যুদ্ধে লব্ধ ধন সম্পত্তির লোভে তারা মুহাম্মদের সঙ্গে ছিলেন। হাদিস ঘাঁটলে দেখা যায় মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কিছু আরব গোত্র তাদের পুরনো ধর্ম বিশ্বাসে ফিরে গিয়ে মূর্তি পূজা শুরু করে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানের উন্নতি থেকে এও প্রমাণ হয় যে নার্সিসিস্ট পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার নামের সাংঘাতিক একটি মানসিক সমস্যা মুহাম্মদের ছিল। নার্সিসিস্টরা নিজেকে নিয়ে এতটাই নিমগ্ন থাকে যে তারা নির্লজ্জের মতো মিথ্যা বলতে পারে। তারা নিজের মিথ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকতে পারে। তাদের মানসিক অবস্থা এমন থাকে যে নিজের মিথ্যাকেই তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে।

আমরা দেখেছি হিটলার একটি বড় মিথ্যার মাধ্যমে লক্ষ কোটি জার্মানদের দিকভ্রান্ত করেছিলেন। তিনি নিজেও একজন নার্সিসিস্ট ছিলেন। ছয় কোটি জীবন নাশের পর আজ জার্মানিতে সবচাইতে ঘৃণিত চরিত্র হলেন হিটলার। গাণিতিক যুক্তিতে মুহাম্মদও একই কাজ করেছেন। হিটলারের কাছে যা ন্যাশনাল সোশ্যালিজম ছিল মুহাম্মদের কাছে তা ইসলাম। দুজনেই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। হিটলারকে নিয়ে ঘৃণার পরিমাণ এত বেশি যে খোদ জার্মানদের কাছেই হিটলার সবচাইতে ঘৃণিত একটি চরিত্রের নাম। ছয় কোটি জীবন হারানোর পর তারা হিটলারকে ছুড়ে ফেলেছে ঘৃণা ভরে; কিন্তু আমদের জানা নেই মুহাম্মদ, কোরান, ইসলাম এবং তার আল্লাহকে আবর্জনার স্তুপের মাঝে ছুড়ে ফেলা পর্যন্ত আমাদের কত কোটি জীবন হারাতে হবে।

***

**কোথা থেকে এসেছে আজকের ইসলাম?** এতদূর পর্যন্ত ইসলামকে কে টেনে এনেছে? কী তার পরিচয়? আসলেই কি ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ নীতিতে নাকি ধর্মীয় বিশ্বাসের বলে? নাকি এসবের পিছনে কারো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে?

**কে ছিলেন মুহাম্মদ?** ঐতিহাসিক নথিপত্রগুলো মুহাম্মদের ব্যাপারে কী সাক্ষ্য দিচ্ছে?

**কোরান কি আল্লাহ নামের কোন সৃষ্টিকর্তার বাণী?** পৃথিবীর একমাত্র অবিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থ?

**এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা।**

**একটি ইস্টিশন ইবুক**

www.istishon.blog